নিউজ লেটার

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা -এর বুলেটিন

৪৫তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা
মে-জুলাই ২০২৪ ইং
জিলক্বদ-মহররম ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
সিরাজুল ইসলাম
নূর হোসেন মজিদী
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
তানজিনা বিনতে নূর

نیوزلتر

نشریه فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا
سال ۴۵، شماره ۱، می - جولای ۲۰۲۴
اردیبهشت - تیر ۱۴۰۳

مدیر مسؤول و سردبیر :
سیدرضا میرمحمدی
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا

اعضای هیئت تحریریه :
سراج الاسلام
نور حسین مجیدی
محمد سعید الاسلام
تنجینه بنت نور

ডিজাইন : নোমান শিশির
মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

১. সম্পাদকীয় ০২

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

২. প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতার শোক বার্তা ০৩

৩. শহীদ ড. রায়িসি বিপ্লবের অসাধারণ নেতা- হুজ্জাতুল ইসলাম মেহেদি ইমানিপুর ০৪

৪. 'প্রেসিডেন্ট রায়িসি ছিলেন ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতীক' - ডা. মিস মরিয়ম সালাম ০৫

৫. ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ০৭

৬. প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান ও জাতির উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ নেতার শুভেচ্ছা-বাণী ০৮

৭. বিশ্বের প্রতি ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বার্তা ০৯

৮. মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনপন্থী ছাত্রদের কাছে সর্বোচ্চ নেতার চিঠি ১২

৯. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতার হজ বাণী ১৪

১০. ইমাম খোমেনী ছিলেন চরমপন্থা বিরোধী; কুরআন ও আহলে বাইত ছিল তাঁর মানদণ্ড ১৫

নির্বাচিত প্রবন্ধ

১১. কুদস দিবসের নামকরণ এবং ফিলিস্তিন ইস্যুকে বাঁচিয়ে রাখতে এর ভূমিকা - নূর হোসেন মজিদী ১৭

১০. ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসলামী বিশ্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য- ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন ২১

১১. ফিলিস্তিন দখলের ইতিহাস: একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ- রাশিদুল ইসলাম ২৪

১২. বাংলাদেশের জনমত ও গণমাধ্যমে ফিলিস্তিন- সিরাজুল ইসলাম ২৮

১৩. ইসরাইলের ওপর ইরানের ঐতিহাসিক হামলার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ - জামালউদ্দিন বারী ৩২

১৪. মানবাধিকার: বিশ্ব রাজনীতিতে শত্রু ঘায়েলের বড় হাতিয়ার- সিরাজুল ইসলাম ৩৭

১৫ ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্ক দৃঢ়করণে ফারসি শিক্ষার ভূমিকা- তানজিনা বিনতে নূর ৪০

সাহিত্য-সংস্কৃতি

১৬. সাদী স্মরণ দিবসের প্রবন্ধ- অধ্যাপক মাজিদ পুইয়ান ৪২

১৭. ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'মানতেকুত তাইর'- ড. আব্দুস সবুর খান ৪৬

পর্যটন

১৮. পবিত্র মাশহাদ নগরী: জিয়ারতকারী ও পর্যটকদের জনপ্রিয় গন্তব্য ৫৪

১৯. ইরানের নতুন পর্যটন আকর্ষণ তিন হাজার বছরের পুরনো কানাত ৫৬

সংবাদ বিচিত্রা ৫৭

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা
বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরনো ৩২), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ফোন : +৮৮০-২-৪১০২০৪২১-২৪
E-mail : dhaka.icro@gmail.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সাময়িকী "নিউজলেটার", যা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছিল এবং অনেক পাঠককের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কিছু কারণে তিন বছর আগে এই প্রকাশনাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কাউন্সেলর হিসেবে যোগদান করার পর এই প্রকাশনাটির পুনঃপ্রকাশের বিষয়ে ভাবতে "নিউজলেটার" এর ভক্তকূল ও পাঠকেরা বারবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। তাই আমি এই জনপ্রিয় প্রকাশনার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করে পুনরায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি এবং "নিউজলেটার" এর বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু আগ্রহী ব্যক্তিদের অধ্যয়নের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

সৌভাগ্যবশত, এই প্রকাশনাটি নতুন করে প্রকাশের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার জন্য সকল প্রচেষ্টা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার কাছে শুকরিয়া জানাই, নিউজলেটারের নতুন প্রকাশনার প্রথম সংখ্যা এখন সকল উৎসাহী পাঠক ও অনুগ্রাহীদের কাছে পৌছাবে।

এই প্রকাশনাটি অতীতে বাংলাদেশে অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং এ দেশের জনসাধারণের মাঝে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রূপে ভূমিকা পালন করেছে। এই ম্যাগাজিনের প্রকাশনা, এর পাঠযোগ্য বিষয়বস্তু এবং বিচিত্রতার কারণেই উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠেছে। ইনশাআল্লাহ, এই ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা নতুন পথে এগিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। নিউজলেটারের বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং বৈচিত্র্যময় লেখার সাথে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তর ও গোষ্ঠীর মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং এর বিনিময়ে তারাও একইভাবে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করবেন ও তা বজায় রাখবেন।

বলা বাহুল্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উন্নয়ন, বিভিন্ন ঘটনাবলীর খবরাখবর, প্রতিবেদন, বিষয়বস্তু এসব নির্ভরযোগ্য চ্যানেল বা বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম ও প্রত্যক্ষ সংবাদমাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ না থাকাসহ আরো নানা কারণে সরাসরি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হাতে খুব সহজে পৌছাতে পারে না। এ কারণে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র -সাংস্কৃতিক, সামাজিক, জ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উন্নয়ন, সাফল্য, অগ্রগতিসহ নানা খবরাখবর ও ঘটনাবলী সাধারণ মানুষের নাগালে পৌছানোর চেষ্টা করছে। এই পথযাত্রায় "নিউজলেটার" নিজের ভূমিকা পালন করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান শূণ্যতা পূরণ করতে পারে।

এখন যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতে 'নিউজলেটার' পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং সম্মানিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌছাচ্ছে, তাই সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদের সকলের নিজ নিজ মতামত ও বিবেচনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এই প্রকাশনার গুণগত মান ও বিষয়বস্তুর অধিকতর উৎকর্ষতা সাধনে ভূমিকা রাখে। যেহেতু, এই প্রকাশনা অনেক কষ্টের পর পুনরায় এর আগ্রহী ও উৎসাহী পাঠকদের ঘরে ঘরে পৌছে যাচ্ছে, সেহেতু এর সফল ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আপনাদের সম্ভাব্য সব রকমের সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান করবেন বলে আমি আশা করছি।

নিঃসন্দেহে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আপনাদের মতামত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবে এবং প্রিয়জনদের মূল্যবান ও ফলপ্রসূ পরামর্শ, প্রস্তাব এবং উপকারী দৃষ্টিভঙ্গির সর্বাধিক ব্যবহার করবে।

এই সুযোগে খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রবন্ধে আমি আমার সকল প্রিয় সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা বিগত বছরগুলোতে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশের জন্য কষ্ট করেছেন এবং আপনারা জীবনের যে অবস্থা বা পর্যায়ে, যেখানেই থাকেন না কেন আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং উন্নতি কামনা করি।

সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী
কালচারাল কাউন্সেলর, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ

প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাত: সর্বোচ্চ নেতার শোকবার্তা

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ তাঁদের সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনায় শোকবার্তা দিয়েছেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী। সর্বোচ্চ নেতা তাঁর শোকবা-র্তায় বলেছেন-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জন-নন্দিত, যোগ্য ও পরিশ্রমী প্রেসিডেন্ট হুজ্জাতুল ইসলাম জনাব সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের মর্মান্তিক খবরটি পেয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছি। এই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে যখন তিনি (রায়িসি) রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মতো সম্মানিত ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের পুরো সময়টা সম্পূর্ণরূপে দেশ, জনগণ ও ইসলামের সেবায় নিরলস প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন স্বল্প সময়ে এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেও তা একই রকম ছিল।

প্রিয় রায়িসি ক্লান্তি কী জিনিস তা যেন জানতেনই না। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ইরান তাঁর সবচেয়ে একনিষ্ঠ ও মহামূ-ল্যবান সম্পদ হারিয়েছে। তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণ ও সন্তুষ্টি সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার পেতো। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টিরই ইঙ্গিতবাহী, তাই কিছু অসাধু মানুষের পক্ষ থেকে অকৃতজ্ঞতা এবং উপহাস তাঁর জন্য পীড়াদায়ক হলেও এগুলোর কিছুই তাঁর দিনরাতের কাজ-কর্ম এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এই কষ্টদায়ক ঘটনায় তাবরিজের জুমার নামাজের ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম, সংগ্রামী, সদাসচেষ্ট ও কর্মোদ্যমী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আব্দুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজানের বিপ্লবী ও ধর্মপরায়ণ গভর্নর জেনারেল মালেক রাহমাতি এবং তাঁদের অন্য সফরসঙ্গীরা আল্লাহর মেহমান হয়েছেন। এই ঘটনায় আমি পাঁচ দিনের সর্বজনীন শোক ঘোষণা করছি এবং ইরানের প্রিয় জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোখবের দেশ পরিচালনার নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি সংসদের স্পিকার ও বিচার বিভাগীয় প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে সর্বোচ্চ ৫০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

পরিশেষে, আমি জনাব রায়িসির প্রিয় মা, তাঁর সম্মানিত স্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্মানিত পরিবারের সদস্যদের প্রতি, বিশেষ করে জনাব আলে-হাশেমের সম্মানিত পিতার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি তাদের ধৈর্য এবং সান্ত্বনার জন্য দোয়া করছি এবং শহীদদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে করুণা কামনা করছি।'

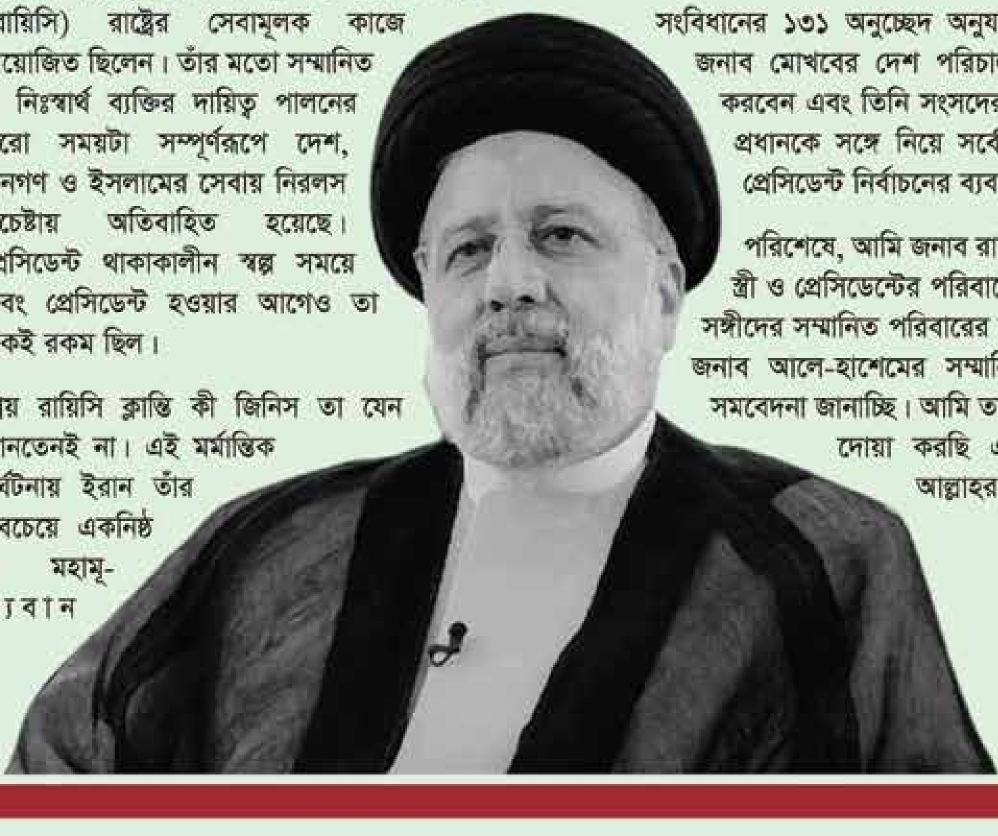

শহীদ ইবরাহিম রায়িসি

শহীদ ড. রায়িসি: বিপ্লবের অসাধারণ নেতা

হুজ্জাতুল ইসলাম মাহদি ইমানিপুর

'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি মৌলিক নীতি (যাকে ইসলামী বিপ্লবের কথামালা হিসেবে উল্লেখ করা হয়) হচ্ছে, বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সমর্থন ও সাহায্য করা। শহীদ ডক্টর সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসির সরকার এমন এক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে যখন বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিম এশীয় অঞ্চল একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত ছিল। তবে যাইহোক, রায়িসি প্রশাসনের মূলনীতি ছিল কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করা। বিশ্বের সাথে সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া এবং সব দেশের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক গভীর করা। সকল প্রতিকূলতা নির্বিশেষে গভীরতম ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসি খুব ভালভাবে জানতেন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সমীকরণে সর্বজনীন ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে পদক্ষেপ নিতে হয়। এই রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণের ফলে আয়াতুল্লাহ রায়িসির কৌশলগত চিন্তার গভীরতা প্রতিফলিত হয়। ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি ও নীতি থেকে তিনি এই কৌশলগত দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বৈদেশিক নীতি এবং জনকূটনীতির ক্ষেত্রে তার উদ্যোগী এবং বুদ্ধিমান পদক্ষেপগুলোর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। তিনি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের দেশগুলোর স্বার্থের দিকেও মনোযোগ দিয়েছিল।

আয়াতুল্লাহ রায়িসি খুব ভালো করেই জানতেন যে, বিপ্লবের কূটনীতিই একমাত্র ন্যায়-অনুসন্ধানী ব্যবস্থা যা স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং জাতির মধ্যে ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং আঞ্চলিক সংহতি বাড়াতে পারে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বেশ কয়েকটি অধিবেশনে তার মূল্যবান উপস্থিতি এবং সেখানে দেয়া বক্তৃতা ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। সব ধর্মের অনুসারীরা তার এই ভাষণ শেয়ার করেছিল। ফলে আন্তর্জাতিক বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে যে এই কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের ভালো বোঝাপড়া ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর মধ্য দিয়ে তিনি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে রায়িসি প্রশাসনের সবচেয়ে গৌরবময় প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ফিলিস্তিন এবং সেখানকার প্রতিরোধের বিষয়ে বাস্তবিকভাবে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী শাসকের অপরাধযজ্ঞ বন্ধ করা। নিঃসন্দেহে শহীদ কূটনীতিক ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান এই অপরাধ সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ড. রায়িসি ছিলেন একজন আন্তরিক সেবার মানুষ এবং একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল ইরানের প্রতিশ্রুতিশীল জনগণের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিলেন না, প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যেও ছিলেন জনপ্রিয়। অনেক বিশ্ব নেতার শোক বার্তা এবং সেসব দেশের জনসাধারণের শোক দিবস পালনই প্রমাণ দেয়- আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ও বিশ্বে আয়াতুল্লাহ রায়িসি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন।

ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা, আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী যথার্থই উল্লেখ করেছেন, "প্রিয় রায়িসি ক্লান্তি কী তা জানতেন না। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ইরানি জাতি একজন আন্তরিক ও মূল্যবান সেবককে হারালো।"

প্রেসিডেন্ট রায়িসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের শাহাদাত ইরান এবং অন্যান্য সত্য-সন্ধানী ও ন্যায়-অন্বেষণকারী জাতির জন্য একটি অসহনীয় ট্র্যাজেডি। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান বারবার প্রমাণ করেছে যে, তার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং তারা সর্বোচ্চ নেতার বিজ্ঞ নেতৃত্বে যেকোনো সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে।

আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক জনগণ এবং এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাকারী শহীদ এবং তাঁর সাথীদের ওপর।

লেখক- প্রেসিডেন্ট, আইসিআরও

‘প্রেসিডেন্ট রায়িসি ছিলেন ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতীক’

ডা. মিস মরিয়ম সালাম

প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসির শাহাদাতে গভীর শোক জানিয়ে তাঁকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন লেবাননের রিসার্চ স্কলার ডা. মিস মরিয়ম সালাম। তিনি বলেন, ‘শহীদ আয়াতুল্লাহ রায়িসি ছিলেন ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতীক। তার অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য ছিল জনগণের জীবন-জীবিকা উন্নত করা। বিশেষ করে অভিজাতদের সন্তুষ্টির চেয়ে সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টির পক্ষেই তার অর্থনৈতিক নীতির উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল।’

ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারকে লেখা এক চিঠিতে ধর্মীয় গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে

শহীদ প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি

লিখেছিলেন: “প্রশাসনে ন্যায়বিচার বজায় রাখুন এবং আগে তা নিজের ওপর কার্যকর করুন। জনগণের রায় জানুন; কেননা জনগণের অসন্তোষ সুবিধাভোগী গুটি কয়েকজনের সন্তুষ্টির পথ বন্ধ করে দেয়, আর অল্প সংখ্যক লোকের অসন্তোষ অনেকের সন্তুষ্টির ভিড়ে হারিয়ে যায়। মনে রাখবেন, কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত লোক অসুবিধার মুহূর্তে আপনার পাশে থাকবে না। তারা ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে, যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি চাইবে। তাদের প্রতি করা অনুগ্রহের জন্য তারা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবে না।”

ইরানি জাতির বিশ্বস্ত কমান্ডার আয়াতুল্লাহ রায়িসির মতও ছিল এটাই। তিনি বিশ্বাস করতেন- অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সন্তুষ্টির চেয়ে জনসন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপালন-কালে শহীদ রায়িসি দেখিয়েছিলেন, তার গৃহীত নীতিগুলো জনগণের সন্তুষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি জনগণের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। জনসন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে তার স্বল্পকালের শাসনামলে বাস্তবায়িত কিছু পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে- একটি ইলেকট্রনিক পণ্য ক্যাটালগ পরিকল্পনা তৈরি করা, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা প্রদান, সরাসরি দাম না বাড়িয়ে রুটি এবং আটার ভর্তুকি আরো কার্যকর করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। বিভিন্ন চাপ সত্ত্বেও রুটি-রুজি, বিনামূল্যে ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান, তরুণদের কর্মসংস্থানের বাধা দূর করা, বিবাহ ঋণ বৃদ্ধি, জনসংখ্যার উৎকর্ষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের জন্য ভর্তুকি বাড়ানো ইত্যাদি। তাঁর প্রশাসনিক কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল- তিনি সরাসরি জনগণের উদ্বেগগুলো শুনেছেন এবং তা সমাধানের জন্য তিনি নিয়মি-তভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেছেন।

ড. রায়িসি বিশ্বাস করতেন, স্বল্পমেয়াদী সুবিধার দিকে মনোযোগ না দিয়ে অবকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগুলোতে মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে অকৃতজ্ঞতা, কটূক্তি এবং কটাক্ষের শব্দগুলোকে উপেক্ষা করা; এর পরিবর্তে এমন নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যা জনগণের দীর্ঘমেয়াদে উপকার করবে। এই নীতিগুলোর তুলনায় কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিলে তা শুধু স্বল্পমেয়াদী সুবিধা প্রদান করবে কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। দুর্বল ব্যাঙ্কগুলোর সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে এসব ব্যাংকের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত অর্থ সৃষ্টি এবং অনিয়ন্ত্রিত তারল্য সৃষ্টির মতো সমস্যাগুলো সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাথে অর্থনৈতিক

ও বাণিজ্য মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি লাভজনক। সাংহাই চুক্তি ও ব্রিকস গ্রুপে ইরানের সদস্যপদ এবং চীন-রাশিয়ার সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মিথস্ক্রিয়া সম্প্রসারণ আর্থিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাগুলোকে উপেক্ষা করতে এবং জনগণের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।

শহীদ আয়াতুল্লাহ রায়িসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে

জনগণের মাঝে প্রেসিডেন্ট রায়িসি

অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত কোষাগার, উল্লেখযোগ্য ঋণ, অস্থিতিশীল ব্যাংক এবং ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ, শস্যের দাম বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং গাজা ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক সংকট। এতসব বাধা সত্ত্বেও, রায়িসি দেশ এবং জনগণের ওপর এই সংকটগুলোর প্রভাব কমাতে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং নীতি বাস্তবায়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট রায়িসির লড়াই

রায়িসি প্রশাসনের মেধাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতা এবং আত্মীয়দের সরকারি কাজে জড়িত হতে নিষেধ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল বৈশিষ্ট্য। মালিক আশতারকে লেখা তার চিঠিতে ইমাম আলী (আ.) যেমন সরকারে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের হস্তক্ষেপ অপসারণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন কারণ এটি

প্রায়শই দুর্নীতি এবং জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। এই পরামর্শ মেনে চললে সরকার কার্যকরভাবে দুর্নীতিকে সমূলে নির্মূল করতে পারে। রায়িসি প্রশাসন ঠিক তাই করেছিল।

মোটকথা, জেনারেল সোলাইমানি যেভাবে সামরিক অঙ্গনে প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শহীদ ড. রায়িসিও চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলোকে অকার্যকর করে সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত উভয়ের সমালোচনায় নির্বিকার ছিলেন এবং অবিচলভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট রায়িসি ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত, নিজের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে তিনি তার কার্যকর মিশনের ইতি টেনেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিত করেছেন, তার কথা এবং কাজগুলা ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে গঠন করবে এবং দেশটিকে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কামনা করছি- প্রেসিডেন্ট রায়িসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের রুহের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

লেখক: লেবাননের গবেষক

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাইদুল ইসলাম

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নয়া প্রেসিডেন্ট ডক্টর মাসুদ পেজেশকিয়ান গত ৩০ জুলাই দেশটির নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। ইরানের জাতীয় সংসদ ভবনের প্রধান হলে ৮৮টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া বিদেশি প্রতিনিধি দলগুলোতে ছিলেন বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সদস্য, রাষ্ট্রদূত এবং ৬০০ দেশী-বিদেশী সাংবাদিক।

প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

ইরানের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ সংসদ সদস্য মাসুদ পেজেশকিয়ান গত ৫ জুলাই শুক্রবার অনুষ্ঠিত ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিজয়ী হন।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান পেয়েছেন এক কোটি ৬৩ লাখ ৮৪ হাজার ৪০৩ ভোট। অন্যদিকে সাবেক প্রধান পরমাণু আলোচক সাঈদ জালিলির প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা এক কোটি ৩৫ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৯।

উল্লেখ্য গত ২৮ জুন অনুষ্ঠিত ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চার প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে কেউ এককভাবে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ভোট না পাওয়ায় নির্বাচন রান অফে গড়ায়। ২৮ জুনের নির্বাচনে ২ কোটি ৪৫ লাখ ভোটার ভোট দেন। এরমধ্যে সংস্কারপন্থী প্রার্থী পেজেশকিয়ান পান এক কোটি ৪ লাখ ভোট। অন্যদিকে, সাবেক প্রধান পরমাণু আলোচক ও বিপ্লবের মূলনীতির অনুসারী সাঈদ জালিলি পান ৯৪ লাখ ভোট।

নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজয়ী মাসুদ পেজেশকিয়ান হচ্ছেন ঝানু সংসদ সদস্য, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট হার্ট সার্জন। ১৯৫৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় আজারবাইজান প্রদেশের মাহাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে এবং প্রথম ডিপ্লোমা অর্জনের পর তিনি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জাবুল শহরে সামরিক বাহিনীতে সার্ভিস দেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে দ্বিতীয় ডিপ্লোমা করবেন। ১৯৭৬ সালে তিনি তাবরিজ মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তার ডাক্তারি লেখাপড়া এবং জেনারেল সার্জারির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৯৩ সালে মাসুদ পেজেশকিয়ান ইরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সেস থেকে কার্ডিয়াক সার্জারিতে একটি উপ-স্পেশালিটি লাভ করেন এবং পরে হার্ট সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ হন। তিনি পাঁচ বছর তাবরিজ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের প্রধানও ছিলেন।

২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ খাতামির প্রশাসনে পেজেশকিয়ান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইরানের জাতীয় সংসদে তিনি কয়েকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন ২০০৮ সালে। দশম জাতীয় সংসদে তিনি ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং চলতি বছরের প্রথম দিকে যে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে তিনি আবারো তাবরিজের প্রতিনিধি হিসেবে বিজয়ী হন। এর আগে তিনি দুইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

২০১৩ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়েও মরহুম আলী আকবর হাশেমি রাফসানজানির প্রতি সমর্থন জানিয়ে নির্বাচনী দৌড় থেকে তিনি সরে দাঁড়ান।

চলতি বছর মাসুদ পেজেশকিয়ান ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে শামিল হন। নির্বাচনে তিনি ন্যায় বিচার, ঐক্য এবং সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

গত ৫ জুলাই শুক্রবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাঈদ জালিলিকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের আগে থেকে তিনি বলেছেন, যদি তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে একটি কমিটি গঠন করবেন যারা প্রশাসনের কর্মকাণ্ড দেখভাল করবে।

প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান ও জাতির উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ নেতার শুভেচ্ছা-বাণী

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী জনগণের কল্যাণে ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে দেশের বিপুল সক্ষমতাগুলো ব্যবহার করাসহ শহীদ প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসির পথ অনুসরণ অব্যাহত রাখতে নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সব প্রার্থী ও নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

অনুষ্ঠানে জড়িত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে বার্তা দিয়েছেন তাতে এই আহ্বান জানান। তাঁর ওই বার্তার প্রধান কিছু অংশ এখানে দেয়া হলো:

পরম করুণাময় ও অশেষ দাতা আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

সব প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রভু এবং দরূদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পবিত্র বংশধরদের ওপর এবং বিশেষ করে ইমাম মাহদির ওপর (আমার আত্মা তাঁর জন্য কুরবান হোক)

মহান আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ, সর্বশক্তিমান ও করুণাময় আল্লাহর সহায়তায় মহান ইরানি জাতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্টকে হারানোর বড় বিপর্যয়ের পর খুব স্বল্প আইনি সময়ের মধ্যে। গত দুই শুক্রবারে হয়ে গেল (২৮ জুন ও ৫ জুলাই) অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন। এ নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থীর মধ্য থেকে দেশের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।

দুই দফায় ৫৫ মিলিয়নেরও বেশি ভোট-দাতা জনগণের ও নির্বাচনে জড়িত কর্মকর্তাদের দক্ষতার ও দায়িত্ব অনুভূতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, অচলাবস্থা আর হতাশা সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচন বর্জনের জন্য শত্রুদের ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও জাতি এক অবিস্মরণীয় ও উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে।

ইরানি জাতি এখন তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে। আমি পুরো জাতিকে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি দেশের মর্যাদা ও বেড়ে চলা অগ্রগতির জন্য সবাইকে সহযোগিতা ও সুচিন্তার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিযোগিতার মনোভাব এখন বন্ধুত্বে পরিণত হওয়া জরুরি এবং প্রত্যেকের উচিত দেশের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো।

তিনি নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডক্টর পেজেশকিয়ানকে মহান দয়াময় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে শহীদ প্রেসিডেন্ট রায়িসির পথে চলা অব্যাহত রাখার এবং দেশের বিপুল সামর্থ্যগুলো কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। বিশেষ করে বিপ্লবী যুব সমাজ ও বিশ্বাসী জনশক্তিকে এক্ষেত্রে নিয়োগের আহ্বান জানান যাতে জনকল্যাণ ও দেশের অগ্রগতির পথ সুগম হয়। সবশেষে তিনি আবারো মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও ইমাম মাহদির প্রতি সালাম জানিয়ে এবং সব শহীদের স্মৃতি ও মহান ইমাম খোমেনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। সর্বোচ্চ নেতা জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা ও নিরাপত্তা বিভাগের সবার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিশ্বের প্রতি ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বার্তা

ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দৈনিক তেহরান টাইমস পত্রিকায় নতুন বিশ্বের প্রতি একটি বার্তা দিয়েছেন। ওই বার্তায় মাসুদ পেজেশকিয়ান বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে তাঁর সরকারের সম্পর্ক, আফ্রিকা, চীন, রাশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার সাথে সম্পর্ক বিষয়ে ওই বার্তায় তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন: ইরানের নতুন সরকার উত্তেজনা কমানোর যে-কোনো সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবে এবং সততার সাথে ওই প্রচেষ্টার জবাব দেবে। পার্সটুডে আরও জানায়, 'নতুন বিশ্বের কাছে আমার বার্তা' শিরোনামের নোটে তিনি গতানুগতিক ঐতিহ্যের উর্ধ্বে উঠে বৈশ্বিক পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। বিশ্বের দক্ষিণ ভূগোলে উদীয়মান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও নেতাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করার ওপরও জোর দিয়েছেন পেজেশকিয়ান।

প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

তেহরান টাইমস-কে দেওয়া মাসুদ পেজেশকিয়ানের নোট: নতুন বিশ্বের কাছে আমার বার্তা

আঞ্চলিক যুদ্ধ ও অস্থিরতার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রদর্শন করেছে। কোনো কোনো দেশের ইরান বিশেষজ্ঞদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নির্বাচন পরিচালনার সুষ্ঠু পদ্ধতি, বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা ইমাম খামেনেয়ীর বিচক্ষণতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইরানের জনগণ যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই সত্য প্রদর্শিত হয়েছে এই নির্বাচনে।

আমি 'সংস্কার', 'জাতীয় ঐক্য শক্তিশালীকরণ' এবং 'বিশ্বের সাথে পারস্পরিক গঠনমূলক সহযোগিতা'র ওপর জোর দিয়ে নির্বাচনী কর্মসূচি নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছি। অবশেষে আমি আমার দেশবাসী, এমনকি যুব ও তরুণ সমাজের-যারা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ছিল-তাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে ভোট প্রদানে আকৃষ্ট করতে সফল হয়েছি।

এই আস্থা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আমি নির্বাচনী প্রচার-ণার সময় আমার দেশের জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ঐকমত্য সৃষ্টি করে সেইসব অঙ্গিকার পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন: প্রথমেই আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমার সরকার যে কোনো পরিস্থিতিতে ইরানের জাতীয় সম্মান ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষাকে এজেন্ডার শীর্ষে রাখবে। ইরানের পররাষ্ট্র নীতি সম্মান, প্রজ্ঞা এবং সুবিধার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রেসিডেন্ট ও সরকারের উপর ন্যস্ত। আমি এই মহান লক্ষ্যে পৌছাতে প্রেসিডেন্টকে দেওয়া সকল সাংবিধানিক ক্ষমতা কাজে লাগাতে চাই।

আমার সরকার ইরানের জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সকল দেশের সাথে একটি ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে আঞ্চলিক এবং বিশ্ব অঙ্গনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে চায়। এ বিষয়ে উত্তেজনা কমানোর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সততার সাথে আমরা সেই প্রচেষ্টার জবাব দেব।

আমার সরকারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আমরা একটি শক্তিশালী অঞ্চল গঠনের চেষ্টা করব। এমন সম্পর্ক নয় যেখানে একটি দেশ অন্যদের ওপর একক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর উচিত তাদের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করার মতো প্রতিযোগিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং একে অপরের ওপর অপ্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা আরোপের দিকে ধাবিত না হওয়া। বরং তার পরিবর্তে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি পরিবেশ

তৈরি করা যেখানে প্রত্যেকের সম্পদ এ অঞ্চলের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য, সবার সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করতে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে, যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে, অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং সংলাপ, বিশ্বাস স্থাপন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক কাঠামো তৈরির দিকে এগিয়ে যেতে আমরা তুরস্ক, সৌদি আরব, ওমান, ইরাক, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবো।

আমাদের অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সন্ত্রাস ও চরমপন্থা, মাদক পাচার, পানি সংকট, শরণার্থী সংকট, পরিবেশ ধ্বংস এবং বিদেশি হস্তক্ষেপের মতো নানান সংকটে জর্জরিত। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর আগামি গড়ে তুলতে এইসব কমন চ্যালেঞ্জগুলোকে একযোগে মোকাবেলা করার এখনই সময়।

আঞ্চলিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতাই হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার আলোয় সমৃদ্ধ যেসব মুসলিম দেশের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য সেসব দেশকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শক্তির যুক্তির পরিবর্তে যুক্তির শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। আমরা শান্তি প্রসার ঘটিয়ে, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে, সংলাপ জোরদার করে এবং ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা করে পোস্ট-পোলার ওয়ার্ল্ড অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি। এ ক্ষেত্রে ইরান ভূমিকা রাখতে অবশ্যই প্রস্তুত রয়েছে।

১৯৭৯ সালে, ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ছিল উদীয়মান একটি নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা। তখনকার সরকার আন্তর্জাতিক আইনের মানদণ্ড এবং মানবাধিকারের মৌলিক নীতির ভিত্তিতে ইসরাইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি বর্ণবাদী সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আজ অবধি ইসরাইল একটি বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থা হিসেবেই রয়ে গেছে। বরং তার দখলদারিত্ব, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত নির্মূল অভিযান, অবৈধ বসতি স্থাপন, পারমাণবিক অস্ত্র, ভূমির অবৈধ সংযুক্তি এবং তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের কালো রেকর্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'গণহত্যা'।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমার সরকার প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে সহযোগিতার অনুরোধ করবে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সকল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাজার জনগণের ওপর গণহত্যা বন্ধ করতে এবং যুদ্ধবিরতির পরিধির বিস্তার রোধ করতে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেবে।

ফিলিস্তিনিদের চার প্রজন্মের জীবনকে ধ্বংস করেছে ইসরাইলি দখলদারিত্বের দীর্ঘসূত্রিতা। অতএব দীর্ঘ দখলের অবসান ঘটাতে আমাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম ও কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি জোর দিয়ে বলছি, সরকারগুলোকে "১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশন" এর ভিত্তিতে গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকতে হবে। বিশেষ করে অপরাধীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মাধ্যমে প্রক্ষান্তরে গণহত্যাকে পুরস্কৃত করা যাবে না!

আজ মনে হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক তরুণই ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমি এই সাহসী প্রজন্মকে বলতে চাই, ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমাদের নীতিগত অবস্থানের কারণে ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগ শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ভুলই নয়, বরং তা আমাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং মৌলিক মূল্যবোধেরও অবমাননার শামিল। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো ইহুদি-বিদ্বেষের এই অভিযোগগুলো ইসরাইলিদের অন্যান্য অভিযোগগুলোর মতোই ভিত্তিহীন। তোমরা যখন ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবাদ করেছো তখন তোমাদের ওপর যেরকম অভিযোগ চাপানো হয়েছিল এগুলোও সেরকম।

কঠিন সময়ে চীন এবং রাশিয়া সবসময় আমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। আমরা এই বন্ধুত্বকে ভীষণ মূল্য দিই। ইরান ও চীনের ২৫ বছরের রোড ম্যাপ ছিল উভয় দেশের জন্য উপকারী। 'ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব' তৈরির ক্ষেত্রে এই রোড-ম্যাপ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রাক্কালে বেইজিংয়ের সাথে বৃহত্তর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। ২০২৩ সালে চীন সরকার সৌদি আরবের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ওই পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখেছে।

রাশিয়াও ইরানের একটি মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার এবং প্রতিবেশী। আমার সরকার দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের জনগণের জন্য শান্তি কামনা করি এবং আমার সরকার এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত থাকবে। আমার সরকার রাশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতাকে

কঠিন সময়ে চীন এবং রাশিয়া সবসময় আমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। আমরা এই বন্ধুত্বকে ভীষণ মূল্য দিই। ইরান ও চীনের ২৫ বছরের রোড ম্যাপ ছিল উভয় দেশের জন্য উপকারী। 'ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব' তৈরির ক্ষেত্রে এই রোড-ম্যাপ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রাক্কালে বেইজিংয়ের সাথে বৃহত্তর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। ২০২৩ সালে চীন সরকার সৌদি আরবের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ওই পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখেছে।

অগ্রাধিকার দেবে বিশেষ করে ব্রিকস, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের মতো কাঠামোতে।

আমার সরকার গ্লোবাল সাউথের উদীয়মান আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের সাথে, বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পর্ক জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের সহযোগিতা ও সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করব।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সাথে ইরানের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আমার সরকার সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সংলাপ ও সহযোগিতা বজায় রাখতে এবং সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

ইরান ও ইউরোপের মধ্যকার সম্পর্কে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে আমেরিকা জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন (জেসিপিওএ) বা পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে যাবার পর ইউরোপীয় দেশগুলি ইরানকে ১১টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরমাণু চুক্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং ইরানের অর্থনীতির ওপর অবৈধ ও একতরফা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রভাবকে সংযত করতে ওই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ওই প্রতিশ্রুতিতে কার্যকর ব্যাঙ্কিং লেনদেনের গ্যারান্টি, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোম্পানিগুলির কার্যকর সুরক্ষা এবং ইরানে বিনিয়োগ প্রসারের কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলি ওইসব প্রতিশ্রুতি কেবল লঙ্ঘনই করে নি বরং তারা অযৌক্তিকভাবে আশা করে যে ইরান একতরফাভাবে পরমাণু সমঝোতার সমস্ত অঙ্গিকার পূরণ করবে।

এইসব বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতির ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ককে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমি ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে গঠনমূলক সংলাপ করতে প্রস্তুত।

ইউরোপীয় দেশগুলোর উপলব্ধি করা উচিত যে ইরানি জনগণ অত্যন্ত গর্বিত। তাদের অধিকার ও মর্যাদাকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখনই এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মনগড়া ধারণা থেকে সরে আসবে, সেইসাথে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সম্পর্কের ওপর ছায়া ফেলেছে এমন কৃত্রিম সংকটও কাটিয়ে উঠবে, তখন ইরান ও ইউরোপের মধ্যে সহযোগিতার অনেক সুযোগ তৈরি হবে, সেইসব সুযোগ নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

সহযোগিতার সুযোগের মধ্যে রয়েছে: অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, জ্বালানি নিরাপত্তা, ট্রানজিট রুট, পরিবেশ, সেইসাথে সন্ত্রাসবাদ ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, শরণার্থী সংকটসহ আরও বহু ক্ষেত্র।

আমেরিকাকেও বুঝতে হবে ইরান কখনো বলদর্পিতার জবাব দেয় নি এবং কখনোই দেবে না। আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৫ সালে পরমাণু সমঝোতায় প্রবেশ করেছিলাম এবং আমরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণভাবে পূরণ করেছি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি সংক্রান্ত বিরোধ এবং প্রতিশোধ চিন্তার কারণে ওই চুক্তি থেকে অবৈধভাবে বেরিয়ে গেছে। সমঝোতা থেকে একতরফাভাবে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে আমেরিকা ইরানের ওপর অবৈধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সময়টা ছিল করোনা মহামারীর কাল। নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাধ্যমে তারা ইরানের জনগণের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। জানমালের দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি করেছে তারা। শত শত বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ইরান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছে। সেইসাথে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে। একজন বিশ্বখ্যাত সন্ত্রাসবিরোধী নায়ক ছিলেন জেনারেল সোলাইমানি। আইএসআইএস-এর মতো বর্বর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সংঘাত থেকে এ অঞ্চলকে বাঁচাতে তিনি একজন সফল বীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিশ্ব আজ আমেরিকার ওই সিদ্ধান্তের ক্ষতিকর পরিণতি প্রত্যক্ষ করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা শুধুমাত্র এ অঞ্চল ও বিশ্বের উত্তেজনা নিরসন ও নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক সুযোগই হাতছাড়া করে নি বরং অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি-এনপিটি'রও মারাত্মক ক্ষতি করেছে। কারণ তারা প্রমাণ করেছে এনপিটি চুক্তি মেনে চলার খরচ চুক্তি না মানার সম্ভাব্য সুবিধার চেয়ে বেশি হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার অনুমানের বিপরীতে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে একটি সঙ্কট তৈরি করতে এনপিটি'র অপব্যবহার করেছে। আমাদের জনগণের ওপর তারা ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে পরমাণু কর্মসূচিকে ব্যবহার করেছে। অপরদিকে একই সময়ে তারা সক্রিয়ভাবে এবং দ্বিধাহীনভাবে ইসরাইলকে সমর্থন করে গেছে। যেই ইসরাইল হলো একটি দখলদার, আগ্রাসী ও বর্ণবাদী সরকার। তারা এনপিটি চুক্তির সদস্যও নয় এবং সমস্ত তথ্য-উপাত্তে প্রমাণিত যে তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।

আমি আবারও গুরুত্বের সাথে বলতে চাই, ইরানের প্রতিরক্ষা নীতিতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি নেই। আমি আমেরিকাকে তার অতীতের ভুল হিসেব-নিকেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি নয়া নীতি গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকদের বোঝা উচিত এ অঞ্চলের দেশগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর নীতি অতীতে যেমন সফল হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তাদের উচিত ইরানের বাস্তবতাকে স্বীকার করা এবং বিদ্যমান উত্তেজনা বৃদ্ধির নীতি পরিহার করা।

ইরানের জনগণ আমাকে একটি শক্তিশালী দায়িত্ব দিয়েছে। সেটা হলো আমি যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপর জোর দিই। যারা এই ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

(তেহরান টাইমস অবলম্বনে)

মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রতি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার চিঠি

'হে তারুণ শিক্ষার্থীরা তোমরা সঠিক অবস্থান নিয়েছ'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র সমাজ ও তরুণদের উদ্দেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী চিঠি লিখেছেন। সেখানে তিনি ফিলিস্তিনপন্থী মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেছেন। চিঠিটির অনুবাদ তুলে ধরা হলো।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

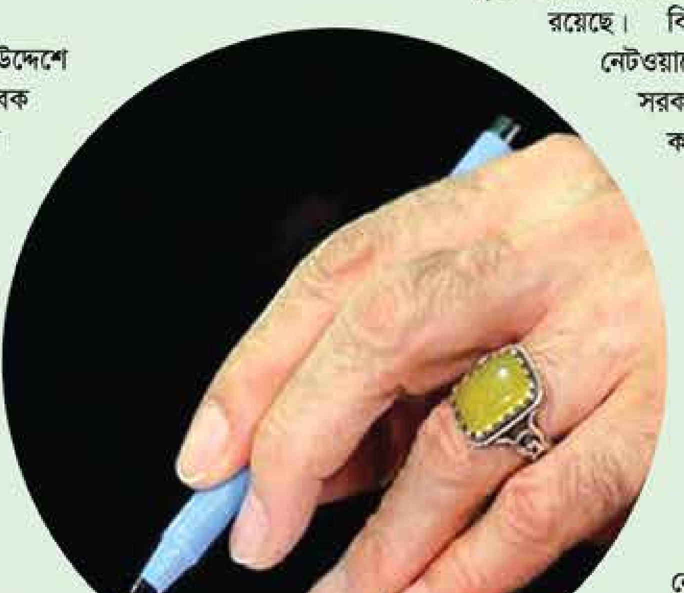

আমি এই চিঠিটি সেই তরুণদের উদ্দেশে লিখছি যাদের জাগ্রত বিবেক তাদেরকে গাজার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের রক্ষায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় তরুণ শিক্ষার্থীরা! এটি তোমাদের প্রতি আমার সহানুভূতি এবং সংহতির বার্তা। বর্তমানে যে ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাতে তোমরা সঠিক পক্ষে অবস্থান নিয়েছ।

তোমরা প্রতিরোধ ফ্রন্টের একটা অংশ গড়ে তুলেছ এবং দখলদার ও নির্দয় ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রকাশ্য সমর্থক মার্কিন সরকারের নিষ্ঠুর চাপের মধ্যে থেকেও একটা সম্মানজনক সংগ্রাম শুরু করেছ।

তোমরা যে উপলব্ধি ও অনুভূতি নিয়ে সংগ্রাম করছ ঠিক সেই উপলব্ধি ও অনুভূতি নিয়েই তোমাদের থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে বিশাল এক প্রতিরোধ ফ্রন্ট বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হলো- প্রকাশ্য জুলুম বন্ধ করা যা 'জায়নবাদী' (ইহুদিবাদী) নামক সন্ত্রাসী ও নির্দয় নেটওয়ার্ক ফিলিস্তিনি জাতির ওপর বহু বছর ধরে চালিয়ে আসছে এবং তাদের দেশ দখল করার পর তাদের ওপরই চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। বর্ণবাদী ইসরাইল আজ যে গণহত্যা চালাচ্ছে তা গত কয়েক দশক ধরে চলমান চরম জুলুম ও নিষ্ঠুরতারই ধারাবাহিকতা।

মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিয়ে গঠিত একটি জাতির স্বাধীন ভূখণ্ড হলো ফিলিস্তিন এবং এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের পর জায়নবাদী নেটওয়ার্কের পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ধীরে ধীরে কয়েক হাজার সন্ত্রাসীকে এই ভূখণ্ডে নিয়ে আসে; তারা শহর ও গ্রামে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা অথবা তাদেরকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চলে যেতে বাধ্য করে। তারা সেখানকার মানুষের কাছ থেকে তাদের বাড়িঘর, বাজার ও ক্ষেত-খামার কেড়ে নেয় এবং দখলিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে 'ইসরাইল' নামে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম ব্রিটিশ সাহায্যের পরে এই দখলদার সরকারের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা দখলদারদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে, এমনকি ক্ষমার অযোগ্য অসাবধানতার সাথে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথ খুলে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সাহায্য করে যাচ্ছে।

প্রথম দিন থেকেই জায়নবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনের অসহায় জনগণের বিরুদ্ধে 'লৌহ মুষ্টি' নীতি অবলম্বন করেছে। তারা সব

ধরণের বিবেক-বিবেচনা এবং মানবীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে দিন দিন বর্বরতা, সন্ত্রাস ও নিপীড়ন বৃদ্ধি করেছে। মার্কিন সরকার ও অন্য সহযোগীরা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ভ্রূকুটিও প্রদর্শন করেনি। এখনও গাজায় চলমান ভয়াবহ অপরাধ সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কিছু বক্তব্য অবাস্তব এবং ভণ্ডামিপূর্ণ।

এমনি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতাশাজনক পরিবেশ থেকে প্রতিরোধ ফ্রন্টের উদ্ভব হয় এবং ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার পর তা এই ফ্রন্টকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করে তোলে। আন্তর্জাতিক জায়নবাদের নেতারা এই মানবিক ও সাহসী প্রতিরোধকে সন্ত্রাসবাদ বলে ঘোষণা করেছে। আর এই জায়নবাদী নেতারাই আমেরিকা ও ইউরোপের বেশিরভাগ মিডিয়া কোম্পানির মালিক অথবা এসব কোম্পানিতে তাদের অর্থ ও ঘুষের প্রভাব রয়েছে। যে জাতি ইহুদিবাদী হানাদারদের অপরাধের মোকাবেলায় নিজ ভূমিতে আত্মরক্ষা করে সে কি সন্ত্রাসী?! আর এমন জাতিকে মানবিক সাহায্য দেওয়া এবং তাদের হাতকে শক্তিশালী করা কী সন্ত্রাসবাদের প্রতি সাহায্য বলে বিবেচিত হতে পারে?

বিশ্ব আধিপত্যবাদের বিদ্বেষী নেতারা সবচেয়ে মৌলিক মানবিক ধারণাগুলোকেও বিকৃত করছে। তারা এমন ভান করে যে, নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসী ইসরাইল আত্মরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে; আর স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফিলিস্তিনিরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে। তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। আমি তোমাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার সংবেদনশীল অঞ্চলের জন্য ভিন্ন রকমের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। বিশ্বব্যাপী অনেক বিবেক জাগ্রত হয়েছে এবং সত্য প্রকাশ পাচ্ছে। প্রতিরোধফ্রন্ট শক্তিশালী হয়েছে এবং আরও শক্তিশালী হবে। নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

তোমরা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও জনগণপ্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। তোমাদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সহযোগিতা ও সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ঘটনা যা সরকারের পুলিশি পদক্ষেপের তীব্রতা ও চাপের মোকাবেলায় কিছুটা স্বস্তিদায়ক। আমি তোমাদের প্রতি অর্থাৎ তরুণদের প্রতি সহানুভূতি জানাই এবং তোমাদের দৃঢ়তাকে সম্মান করি। আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য এবং বিশ্বের সকল মানুষের জন্য কুরআনের শিক্ষা হলো- সত্যের পথে অবিচল থাকা: "কাজেই আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অবিচল থাকুন" (সূরা হুদ, আয়াত ১১২ একাংশ)। আর মানব সম্পর্কের বিষয়ে কোরানের শিক্ষা হলো-"অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯ একাংশ)। এই আদেশসহ এ ধরণের আরও শত শত আদেশ রপ্ত করার পাশাপাশি সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ ফ্রন্ট এগিয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অর্জন করবে।

আমি তোমাদেরকে কুরআনের সাথে পরিচিত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী
২৫ মে, ২০২৪।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার হজবাণী

পবিত্র হজ-২০২৪ উপলক্ষে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বাণী দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, গাজা ট্র্যাজেডি এবং নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূর্ত প্রতীক পতনশীল ইহুদিবাদী ইসরাইলের ঔদ্ধত্য কোনো মুসলিম ব্যক্তি, দল, সরকার ও সম্প্রদায়ের সামনে এ ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা ও সহ্যের সুযোগ অবশিষ্ট রাখেনি। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পূর্ণাঙ্গ হজবাণীর বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন ওয়াস সালাতু ওয়াসসালামু আলা খাইরিল বারিয়্যাতি সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদিল মুস্তাফা ওয়া আলেত্বাইয়িবিনা ওয়া সাহবিহিল মুনতাজিবিনা, ওয়া মান তাবিয়াহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দিন।

যে হৃদয়গ্রাহী ইব্রাহিমি সুর আল্লাহর নির্দেশে সব যুগেই হজের মৌসুমে সব মানুষকে কাবার দিকে আহ্বান করে, তা এ বছরও সারা বিশ্বের বহু মুসলমানের হৃদয়কে একত্ববাদ ও ঐক্যের এই কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং বৈচিত্র্যময় বিশাল জনসমাবেশের জন্ম দিয়েছে, মানবিক পরিধি ও ইসলামের আধ্যাত্মিক উপাদানের শক্তিকে স্বজাতি ও বিজাতির সামনে তুলে ধরেছে।

হজের বিশাল সমাবেশ এবং বহুমাত্রিক ও পর্যায়ক্রমিক আচার-অনুষ্ঠানকে চিন্তাশীল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হলে তা একজন মুসলমানের জন্য শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উৎস হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে শত্রু এবং অকল্যাণকামীদের মনে ভয় ও বিস্ময়ের জন্ম দেয়। মুসলিম উম্মাহর শত্রু ও অকল্যাণকামীরা হজের এই দুটি দিক সম্পর্কেই নানা সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। এমনটি ঘটলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই; তারা মাজহাবগত ও রাজনৈতিক পার্থক্যকে বড় করে তুলে ধরে অথবা হজের পবিত্র ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে এই কাজ করতে পারে।

পবিত্র কুরআন হজকে আল্লাহর দাসত্ব, আল্লাহর স্মরণ ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ; মানুষের সমমর্যাদা, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুশৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ, কল্যাণ ও সুপথের বহিঃপ্রকাশ, (মুসলিম) ভাইদের মধ্যে নৈতিক প্রশান্তি ও কার্যকর সমঝোতার বহিঃপ্রকাশ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দৃঢ় অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেছে।

হজ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এবং এই তুলনাহীন ফরজ দায়িত্বের আচার-অনুষ্ঠানাদির মতো বিষয়গুলোর পাশাপাশি এসবের রহস্যগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে হজের জটিল সংমিশ্রণ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাজি ভাই ও বোনেরা, আপনারা এখন এই সত্য ও সমৃদ্ধ শিক্ষা অনুশীলনের অঙ্গনে অবস্থান করছেন। নিজেদের চিন্তা এবং কর্মকে এই সত্য ও শিক্ষার কাছাকাছি নিয়ে আসুন। এই মহৎ বিষয়গুলোর মিশ্রণ ঘটিয়ে পুনরুদ্ধারকৃত আত্মপরিচয় নিয়ে ঘরে ফিরুন। এটাই আপনার হজের মূল্যবান এবং সত্যিকারের উপহার সামগ্রী।

অতীতের তুলনায় এ বছর বারাআতের বিষয়টি বশি গুরুত্বহ। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসের নজিরবিহীন গাজা ট্র্যাজেডি এবং নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূর্ত প্রতীক পতনশীল ইহুদিবাদী ইসরাইলের ঔদ্ধত্য কোনো মুসলিম ব্যক্তি, দল, সরকার ও সম্প্রদায়ের সামনে এ ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা ও সহ্যের সুযোগ অবশিষ্ট রাখেনি। এই বছরের বারাআত (মুশরিকদেরকে প্রত্যাখ্যান) হজ মৌসুম ও মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত সব দেশ ও শহরে বিস্তৃত করতে হবে এবং হাজিদের বাইরেও তা সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তার সহযোগী গোষ্ঠী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বারাআতের বিষয়টি সব জাতি এবং সরকারের কথা ও কাজে প্রকাশ পেতে হবে এবং জল্লাদদের জন্য ক্ষেত্র সংকুচিত করতে হবে।

ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তার সহযোগী গোষ্ঠী বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বারাআতের বিষয়টি সব জাতি এবং সরকারের কথা ও কাজে প্রকাশ পেতে হবে এবং জল্লাদদের জন্য ক্ষেত্র সংকুচিত করতে হবে।

ফিলিস্তিনের ইস্পাত-কঠিন প্রতিরোধ এবং গাজার ধৈর্যশীল ও নির্যাতিত মানুষদের প্রতি অবশ্যই সর্বতোভাবে সমর্থন দিতে হবে। গাজার মানুষের ধৈর্য্য ও প্রতিরোধের মহিমা গোটা বিশ্বকে তাদের প্রশংসা করতে ও তাদের প্রতি সম্মান জানাতে বাধ্য করেছে।

আমি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দ্রুততার সঙ্গে একটি পরিপূর্ণ বিজয় এবং প্রিয় হাজিদের হজ যাতে কবুল হয় সে জন্য দোয়া করছি। হজরত বাকিয়াতুল্লাহ'র (তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ হোক) দোয়া আপনাদের সঙ্গে থাকুক।

ওয়াসসালামু আলাইকুম

সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী
৪ জিলহজ, ১৪৪৫ (১১ জুন, ২০২৪)
ফার্সি ২২ খোরদাদ ১৪০৩

ইমাম খোমেনী ছিলেন চরমপন্থা বিরোধী; কুরআন ও আহলে বাইত ছিল তাঁর মানদণ্ড

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ধর্মতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি বলেছেন, ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (র) ছিলেন সবরকমের চরমপন্থা বিরোধী এবং কুরআন ও আহলে বাইত ছিল তাঁর মানদণ্ড। সম্প্রতি 'দ্যা স্প্রিচুয়াল সিল্ক রোড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

চলেছে। তবে সহযোগিতার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এই অঞ্চলের বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর দ্বিপক্ষীয় এবং এই অঞ্চলের জাতিগুলোর অভিন্ন স্বার্থের বিষয়টি নির্ভর করছে।"

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি আরো বলেন, ইরানের ইসলামী

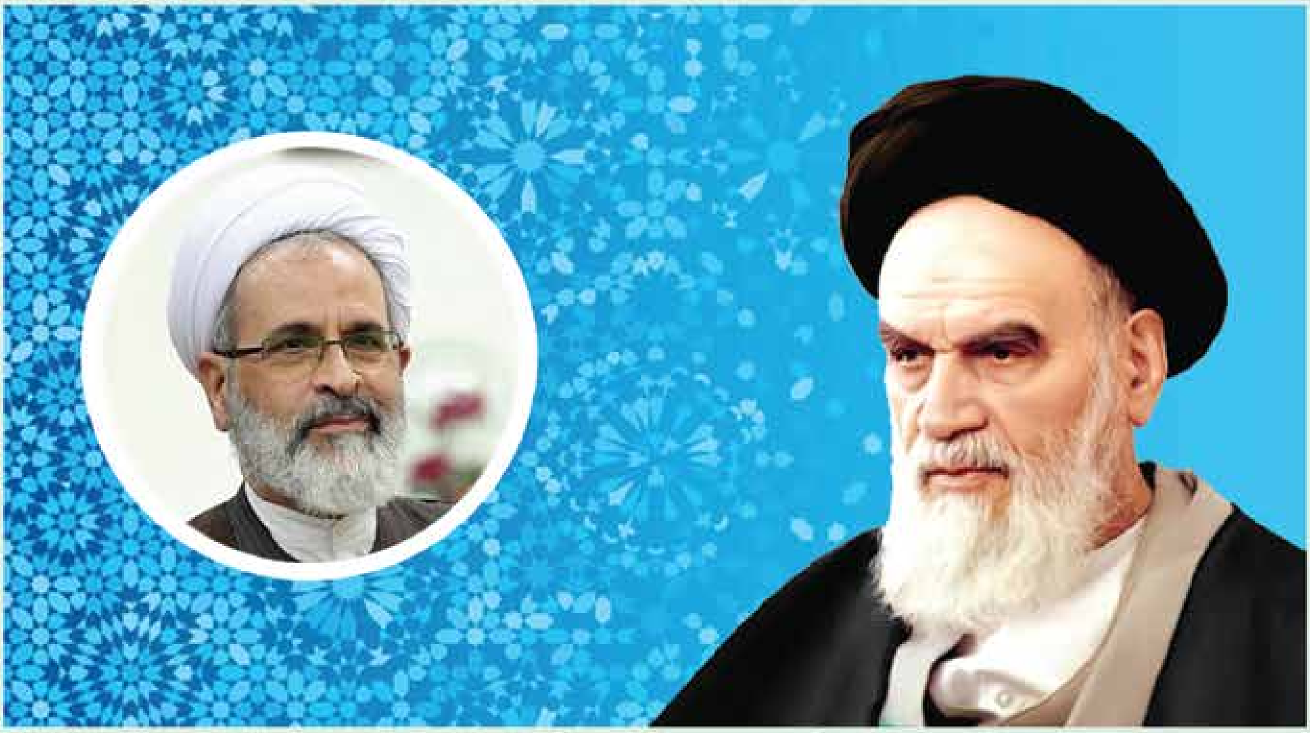

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি এবং ইমাম খোমেনী (রহ.)

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি বলেন, প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা মোকাবেলা করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে বলা হয়, বিগত বছরগুলোতে উগ্র তাকফিরি, সালাফি ও ওয়াহাবীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে ইসলামের ব্যাপারে যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে তার ফলে পশ্চিম এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের বহু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণেই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য ইরানের সাথে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার জরুরি।

ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক পাঠ ও ভুল পাঠ

এ ব্যাপারে সম্মেলনে আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি বলেন, "সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপাক্ষিকভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতা করে

বিপ্লবের আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন শরীফ এবং বিশ্ব নবীর আহলে বাইতের ইমামদের খাঁটি শিক্ষা যেখানে চরমপন্থার কোনো স্থান নেই।

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি এই সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতার অন্য অংশে ইসলামের আলোকে ইসলামী বিপ্লবের বার্তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ইমাম খোমেনী (র.) এবং কোমের ধর্মতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র থেকে ইসলামের যে প্রকৃত বাণী এবং ইসলামী বিপ্লবের যে বার্তা তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে ইসলামের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান উঠে এসেছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আমরা ইসলাম সম্পর্কে দুই ধরণের ভুল বার্তা বা ব্যাখ্যা দেখছি। প্রথম ভুল ব্যাখ্যা হলো- বলা হচ্ছে ইসলামে উদারতার অবস্থান সর্বনিম্নে। এ ধরণের দাবির মাধ্যমে ইবরাহিমি এবং একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে ইসলামের মৌলিক

নীতিমালাগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং এটা পাশ্চিমাদের হীন স্বার্থে করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাকে আমরা বলি 'আমেরিকান ইসলাম'।

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি সম্মেলনে আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে দ্বিতীয় ভুল বার্তা বা ব্যাখ্যা হচ্ছে, শান্তির ধর্ম ইসলামকে উগ্র ও হিংস্র ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা। আর এটা করা হচ্ছে, ধর্মের নামে গড়ে ওঠা উগ্র তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে অজুহাত করে। পশ্চিমাদের সমর্থনে এই বিভ্রান্ত ও উগ্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে এভাবে ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্বে ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম এশিয়ায় উগ্র তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশ বা আইএস জঙ্গিদের উত্থানের কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের বিরুদ্ধে ইরান ও তার কয়েকটি মিত্র যৌথভাবে সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু তারপরও এই উগ্র গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে।

ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করতে হবে।

সম্মেলনে ইরানের জামিয়াতুল মোস্তফার আঞ্চলিক প্রধান, রাশিয়ায় ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান এবং ইবনে সিনা ইসলামিক স্টাডিজ ফাউন্ডেশনের প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন থেকে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা মোকাবেলা করার জন্য রাশিয়া, চীন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বলা হয়, এই তিনটি দেশ একটি শক্তিশালী ত্রিভুজ হিসেবে একসাথে রয়েছে।

সম্মেলনে অংশ নেয়া অন্য বক্তারা বলেন, "ইবরাহিমি ও অন্য একেশ্বরবাদী ধর্মের ভিত্তি একই। তাই এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মকে কাছাকাছি আনতে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

ইমাম খোমেনী (রহ.) এর মাজার

আয়াতুল্লাহ আলী রেজা আরাফি বলেছেন, এ অবস্থায় ইমাম খোমেনী (র.) এবং কোমের ধর্মতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকৃত ইসলামের যে বাণী প্রচার করা হয়েছিল সেটাই ছিল ইসলামের সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ বার্তা। তাই প্রকৃত ইসলামের ওপর ভিত্তি করে আমরা যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছি, তা দার্শনিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে অত্যন্ত সঠিক ও যৌক্তিক। এরই আলোকে আমরা মানবতা এবং মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করি এবং আমরা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও ঐক্যের আহ্বান জানাই। তাই বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ জরুরি।

আয়াতুল্লাহ আরাফি বলেন, এই সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং সকল মানুষের কল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে

বক্তারা ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন মাজহাবকে কাছাকাছি আনার ব্যাপারে মরহুম আয়াতুল্লাহ তাসখিরির চিন্তাভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

তারা বলেন, আজ এই ধরনের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মুসলমানের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সম্মেলন থেকে বলা হয়, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইরান ও তার মিত্র দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রবল চাপ রয়েছে। এ কারণে ইরান এবং তার মিত্র দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আরো জোরদার করা অপরিহার্য।

ইমাম খোমেনী (রহ.) কর্তৃক কুদস দিবসের নামকরণ ও ফিলিস্তিন ইস্যুকে বাঁচিয়ে রাখতে এর ভূমিকা

নূর হোসেন মজিদী

ফিলিস্তিন সমস্যা ইসলামী উম্মাহ্‌র শতাব্দীকালীন প্রাচীন একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যা যা গোটা উম্মাহ্‌র হৃদয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। প্রথমবারের মতো ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেনী (র.) এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মাহে রামাযানের শেষ শুক্রবারকে কুদস দিবস নামকরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের আহ্বান জানিয়ে সমগ্র উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড বহু নবী-রাসূলের (আঃ) স্মৃতিবিজড়িত ভূখণ্ড – কোরআন মজীদে যাকে ارض مقدس। (পবিত্র ভূমি) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে ইসলামের প্রথম ক্বিবলাহ্‌ বায়তুল মুক্বাদ্দাস– যেখান থেকে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মি'রাজ গমন করেন। ইতিহাসের বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে অবশেষে বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতে আসে। তখন থেকে, মধ্যখানে কিছুটা সময় ক্রুসে-ডার শাসন ব্যতীত যতোদিন এ ভূখণ্ডটি মুসলিম শাসনাধীন থাকে তার পুরোটা সময় ফিলিস্তিন তার মুসলিম, খৃস্টান ও ইয়াহূদি অধিবাসীদের জন্য শান্তিপূর্ণ বসবাসের স্থান ছিলো, তেমনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস এ তিন ধর্মের সারা বিশ্বের অনুসারীদের যিয়ারতের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত ছিলো।

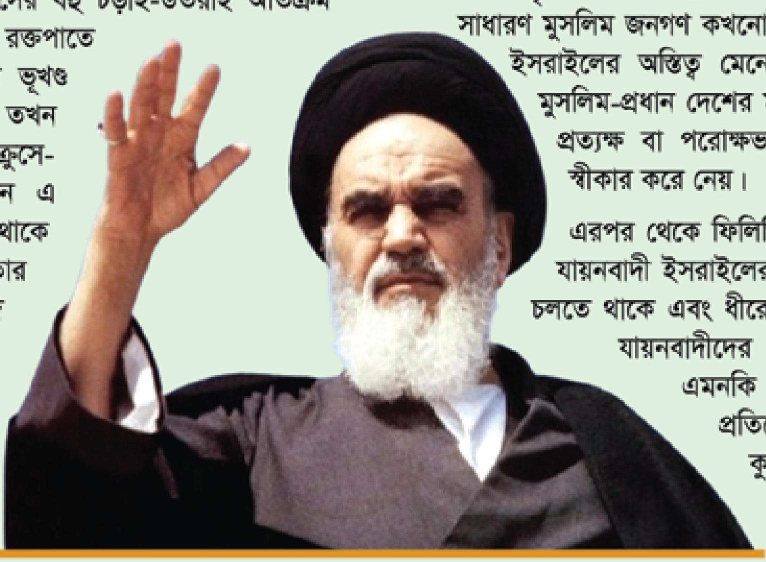

অতঃপর খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উগ্রপন্থী ইয়াহূদি সংগঠন আন্তর্জাতিক যায়নবাদী সংস্থার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অ-ফিলিস্তিনী ইয়াহূদিদের এনে ফিলিস্তিনে বসবাস করানোর কাজ শুরু হয়। তখন যায়নবাদী সংস্থার অর্থানুকুল্যে বহিরাগত ইয়াহূদিরা বেশী মূল্য দিয়ে দরিদ্র ফিলিস্তিনি মুলমানদের নিকট থেকে জমি কিনে নিতে শুরু করে। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ফিলিস্তিন তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে বৃটিশ প্রশাসনের সহায়তায় যায়নবাদীরা জমি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করে ফিলিস্তিনের বাইরে ঠেলে দিয়ে জোর করে ইয়াহূদি অভিবাসনের নীতি কার্যকর করতে থাকে।

কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণ কখনোই জবরদস্তি ইয়াহূদি অভিবাসন মেনে নেয়নি। তাই অনবরত বৃটিশ প্রশাসন ও বহিরাগত ইয়াহূদিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রাম চলতে থাকে। এক্ষেত্রে শহীদ শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন ক্বাসসামের নেতৃত্বাধীন জিহাদ বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সরকারের অসহযোগিতা ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বাসঘাত-কতার কারণে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সে জিহাদ সফল হতে পারেনি। অতঃপর ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১৪ই মে যায়নবাদীরা ফিলিস্তিনের একাংশের ওপর একতরফাভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করে এবং সাথে সাথে যায়নবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে; এরপর বৃটেন ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সকল প্রভাবশালী দেশ তাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণসহ বিশ্বের সাধারণ মুসলিম জনগণ কখনোই অবৈধ যায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেয়নি, যদিও কতক মুসলিম-প্রধান দেশের মার্কিন তাবেদার সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়।

এরপর থেকে ফিলিস্তিনে আরব মুসলমান ও যায়নবাদী ইসরাইলের মধ্যে অনবরত সংঘাত চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ফিলিস্তিনই যায়নবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এমনকি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিবেশী দেশ লেবাননকেও কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হযরত ইমাম খোমেনীর (র.) নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। হযরত ইমাম খোমেনী (র.) অনেক আগে থেকেই সব সময়ই ফিলিস্তিনের মুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে আসছিলেন। ইতোমধ্যে ইসরাইলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর বোমা বর্ষণ করলে হযরত ইমাম খোমেনী (র.) ১৩৯৯ হিজরীর ১৩ই রামাযান মোতাবেক ৭ই আগস্ট ১৯৭৯ তারিখে ইরান ও বিশ্বের মুসলমানদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে রামাযানের শেষ শুক্রবারকে কুদস দিবস হিসেবে নামকরণ করেন এবং আনুষ্ঠানিক-ভাবে এ দিবস পালনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগণের বৈধ অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো ও সংহতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানান। তখন থেকে প্রতি বছর নিয়মিত বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃত দ্বীনদার মুসলমানরা রামাযানের শেষ শুক্রবার কুদস দিবস পালনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি

সংহতি প্রকাশ করে আসছে।

হযরত ইমাম খোমেনী (র.) তাঁর বাণীতে বলেন:

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আমি বিগত বহু বছর যাবত মুসলমানদেরকে অবৈধ দখলদার ইসরাইল রূপী বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসছি, আর ইদানিং ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের পৈশাচিক হামলা তীব্রতর হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ লেবাননে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি সংগ্রামীদেরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইসরাইল তাদের বাড়ীঘরের ওপর বোমা বর্ষণ করে চলেছে। তাই আমি বিশ্বের সকল মুসলিম জনগণের প্রতি ও মুসলিম-প্রধান দেশসমূহের সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, অপনারা অবৈধ দখলদার ইসরাইলের ও তার পৃষ্ঠপোষকদের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হোন।

আমি বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা পবিত্র রামাযান মাসের শেষ শুক্রবারকে– যা কৃদর দিবস সমূহের অন্যতম এবং ফিলিস্তিনের জনগণের ভাগ্যনির্ধারণকারীও হতে পারে– "কুদস দিবস" হিসেবে নির্ধারণ করুন এবং অনুষ্ঠানিক-ভাবে পালনের মাধ্যমে মুসলমানদের বৈধ অধিকারের সমর্থনে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সংহতি ঘোষণা করুন।

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট কাফেরদের ওপরে মুসলমানদের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করছি।

ওয়াস্‌-সালামু 'আলাইকুম্‌ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

রুহুল্লাহ্‌ আল-মুসাভী আল-খোমেনী

তবে ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে হযরত ইমাম খোমেনী (র.) ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিকা কেবল কুদস দিবস ঘোষণা ও প্রতি বছর তা আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পূর্বে স্বৈরাচারী শাহের সরকার ও যায়নবা-দী ইসরাইল সরকারের মধ্য খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। বিপ্লবের পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ও রাষ্ট্রটিকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তেহরানস্থ ইসরাইলী দূতাবাসকে ফিলিস্তিনি দূতাবাসে পরিণত করে ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে তুলে দেয়। এছাড়া, তখন থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার ফিলিস্তিনিদের মুক্তিসংগ্রা-মের সমর্থনে নিয়মিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফিলিস্তিন কনফারেন্সের আয়োজন করা ছাড়াও ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে সেখানকার মুক্তিসংগ্রামীদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে আসছে। অধিকন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে ফিলিস্তিনে জিহাদে ইসলামী বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও হামাস এবং লেবাননে হিযবুল্লাহ নামক সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

পবিত্র আল-কুদস্‌ শহর

১৯৮২ সালে ইয়াহূদি বর্ণবাদী যায়নিস্ট ইসরাইল লেবাননের রাজধানী বৈরুতসহ দেশটির দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল দখল করে নেয় এবং তার অনুগত লেবাননের 'দক্ষিণ লেবানন বাহিনী' (এসএলএ) নামক খৃস্টান মিলিশিয়া গোষ্ঠীর দ্বারা সেখানে অবস্থানরত সাবরা' ও শাতিলা ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে এক পৈশাচিক গণহত্যা ঘটায় এবং ফিলিস্তিনি নেতাদেরকে লেবানন ত্যাগে বাধ্য করে। এমতাবস্থায় ইরানের ইসলামী বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লেবাননের শিয়া মুসলমানরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে লেবানন থেকে ইসরাইলি বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে (১৯৮৪-১৯৮৫'র দিকে) এ প্রতিরোধকারীরা হিযবুল্লাহ নামে নিজেদেরকে সংগঠিত করে।

ইসরাইলী বাহিনী লেবানন ত্যাগের সময় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল

তাদের তাবেদার তথাকথিত দক্ষিণ লেবানন বাহিনীর (এসএলএ) হাতে রেখে যায়। তাই হিযবুল্লাহর পক্ষ হতে এসএলএ এবং ইসরাইল-বিরোধী প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। ২০০০ সালে হিযবুল্লাহ যোদ্ধারা দক্ষিণ লেবানন থেকে এসএলএ-মিলিশিয়া ও ইসরাইলি সৈন্যদেরকে পুরোপুরি বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এরপর ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই তারিখে ইসরাইলী বাহিনী পুনরায় দক্ষিণ লেবানন দখল করার চেষ্টা করে, কিন্তু ৩৪ দিনের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হলে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট ইসরাইলী সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে লেবানন ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা বা পিএলও এবং তার প্রধান অঙ্গদল আল-ফাতাহর আপোসকামী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চারের লক্ষ্যে ১৯৮৭

বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে আল-কুদস্ দিবস

সালে শায়খ আহমাদ ইয়াসিন ইরানের ইসলামী বিপ্লবের চেতনা ও ইসরাইলের উৎখাতের লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হারাকাতুল্ মুক্বাভিমাতিল্ ইসলামীয়াহ্ (ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন-সংক্ষেপে "হামাস" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর হামাস ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামে নতুন প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম হয়।

হামাস ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৩২ আসনের মধ্যে ৭৬ আসন) লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু আমেরিকার চাপে তার বশংবদ ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ 'আব্বাস ২০০৭ সালে হামাসকে বেআইনী ঘোষণা ও হামাস সরকারকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু পুরো গাযা ভূখণ্ডে হামাসের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকায় সেখানে হামাস সরকার তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

ইসরাইল ২০০৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর গাযার ওপরে বড় ধরনের হামলা চালায়। এর ফলে দীর্ঘ ২৩ দিনব্যাপী এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে ২০১৪ সালের ৮ই জুলাই ইসরাইল গাযার ওপরে পুনরায় বড় ধরনের হামলা চালায় যা ৫০ দিন অব্যাহত থাকে। এরপর ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১ সালে ইসরাইল গাযার ওপরে আরো কয়েক বার বড় ধরনের হামলা চালায়। কিন্তু গাযার জনগণের জান-মালের প্রচুর ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইল এসব যুদ্ধে কার্যত হামাসের মোকাবিলায় পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। হামাস ও ইসরাইলের মধ্যকার ২০২১-এর যুদ্ধেও ইসরাইল যুদ্ধবিরতি করতে তথা কার্যত পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর ২০২৩-এর ৭ই অক্টোবর সূচিত যুদ্ধে গাযাবাসীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও হামাসের বিরাট সাফল্য বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হিযবুল্লাহ ও হামাসের সামরিক সাফল্যের মূল হচ্ছে সিরীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে পাঠানো ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আর্থিক ও সামরিক প্রযুক্তি সাহায্য। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃক হামাস যোদ্ধাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও সর্বসাম্প্রতিক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হামাসকে প্রদত্ত ইরানের আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ডলার। তবে ইসরাইলি নিরাপত্তা সূত্রের যে তথ্য ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়েছে তদনুযায়ী হামাসের প্রতি ইরানের বার্ষিক আর্থিক সাহায্য ৩৫ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, ইরানের সামরিক প্রযুক্তি সাহায্য ব্যবহার করেই হামাস এ পর্যন্ত চার হাজার রকেট তৈরি করেছে। বলা বাহুল্য যে, সামরিক প্রযুক্তি সাহায্য মানে ইউএসবি-র মাধ্যমে প্রেরিত প্রোগ্রাম মাত্র নয়, বরং তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও। হামাস আধুনিক অস্ত্রশক্তির অধিকারী না হলে তার সাংগঠনিক শক্তি ইসরাইলের মতো দানব শক্তির মোকাবিলায় কোনো কাজেই আসতো না।

কিন্তু ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সহায়তায় হিযবুল্লাহ ও হামাসের সাফল্য যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী জনমত বৃদ্ধির গুরুত্ব তার চেয়ে মোটেই কম নয় এবং তা অবশ্যই হযরত ইমাম খোমেনী (র.) কর্তৃক মাহে রামাযানের শেষ শুক্রবারকে কুদস দিবস ঘোষণা ও প্রতি বছর বিশ্বের দ্বীনদার মুসলমানদের দ্বারা এ দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের প্রভাবের কাছে ঋণী।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের আগে বিশ্বের মুসলমানদের খুব কম সংখ্যকই ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলো এবং যারা অবগত ছিলো তাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ ইসরাইলের বিলুপ্তি ও পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জুড়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে

মনে করতো। বরং তখন যায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গণ্য করা হতো এবং এর পাশে ফিলিস্তিনের অংশবিশেষে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা ইসরাইলের অধীনে একটি তথাকথিত স্বায়ত্তশাসিত এলাকার স্বপ্ন দেখা হতো। কিন্তু এখন একদিকে যেমন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার ছাড়াও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়েমেনের বিপ্লবী হুথি সরকার ফিলিস্তিনের মুক্তিকে স্বীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে ইরাক ও সিরিয়ায় একই লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

হযরত ইমাম খোমেনী (র.) কর্তৃক মাহে রামাযানের শেষ শুক্রবারকে কুদস দিবস ঘোষণা ও তখন থেকে প্রতি বছর তা পালিত হওয়ার ফলে বর্তমানে বিশ্বের মুসলমানদের অনেকেই ইসরাইলের বিলুপ্তিকে সম্ভব বলে মনে করছে। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে, তারা আর একা নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র দ্বীনদার লোকেরা তাদের সমর্থনে রয়েছে, বিশেষত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তাদের প্রতি কেবল নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনই দিচ্ছে না, বরং আর্থিক ও সামরিকসহ প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে। ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা আগেকার তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে– যা বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে।

হযরত ইমাম খোমেনী (র.) ঘোষিত কুদস দিবসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল এই যে, কেবল ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতেই নয়, বরং বিশ্বের সর্বত্র– বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে একদল মুসলমান সম্ভব হলে ফিলিস্তিনে গিয়ে ফিলিস্তিন মুক্তির জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং এ চেতনা ক্রমেই অধিকতর বিস্তার লাভ করছে। এছাড়া, এর ফলে সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামী উম্মাহ্‌র ঐক্যের চেতনাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইসলামের দুশমনদের বিভ্রান্তিকর বিরূপ অপপ্রচার সত্ত্বেও এ চেতনা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হচ্ছে।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) ঘোষিত কুদস দিবসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল এই যে, কেবল ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতেই নয়, বরং বিশ্বের সর্বত্র– বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে একদল মুসলমান সম্ভব হলে ফিলিস্তিনে গিয়ে ফিলিস্তিন মুক্তির জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং এ চেতনা ক্রমেই অধিকতর বিস্তার লাভ করছে।

অধিকন্তু কুদস দিবস ঘোষণা ও প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যায়নবাদী দখলদারদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচির অন্যতম। ফলে এটা সম্ভব হওয়ার শক্তিশালী ধারণা বিশ্ববাসীর মনে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, যায়নবাদী ইসরাইল যে ফিলিস্তিনের বুকে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র এ সত্যটি ক্রমান্বয়ে অমুসলিমদের দ্বারাও স্বীকৃত হতে শুরু করেছে। আর এটা যায়নবাদী ইসরাইল ও তার অন্ধ পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার জন্য নৈতিক পরাজয় ডেকে এনেছে।

গাযা ও ইসরাইলের সাম্প্রতিকতম যুদ্ধে যায়নবাদী ইসরাইলের সামরিক ব্যর্থতা ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামে আশাব্যঞ্জক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত স্বশাসন কর্তৃপক্ষ শাসিত ফিলিস্তিনের জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এলাকার জনগণের মধ্যেও যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাহ্‌বার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী এখন থেকে ছয় বছর আগে পশ্চিম তীরের মুক্তিকামী ফিলিস্তিনি যুবকদেরকে সশস্ত্র করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর সুফল সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গিয়েছে। পশ্চিম তীরের অনেক ফিলিস্তিনি যুবক একাকী ইসরাইলি এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে শাহাদাতপিয়াসী হামলা চালিয়েছে যা ইসরাইলি ইয়াহূদিদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গাযা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য যায়নবাদী ইসরাইল এবং তার পৃষ্ঠপোষকরা যে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিলো তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি এবং ইসরাইলের অভ্যন্তরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতীকী হামলার সাফল্য ইসরাইলি ইয়াহূদিদের নৈতিক মনোবলক ভেঙে দিয়েছে। তাই ইসরাইলের অভ্যন্তরেই ইসরাইল সরকারের পৈশাচিক নীতির বিরুদ্ধে তার ইয়াহূদি অধিবাসীদের অনেকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তেমনি, প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী, ইসরাইলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-শিক্ষক মানবতাবিরোধী ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং তার প্রতি সহায়তা বন্ধের জন্য মার্কিন সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছেন, এমনকি এজন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণেও দ্বিধান্বিত হননি।

সব কিছু মিলিয়ে এটা আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তিসংগ্রাম ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী ও বৈশ্বিক পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী হচ্ছে এবং মানবতাবিরোধী যায়নবাদী ইসরাইলের অস্তিত্ব ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় যে, অবৈধ যায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ও সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দূরে নয়। আর এজন্য সবচেয়ে বেশী অবদান হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) কর্তৃক ফিলিস্তিন মুক্তকরণের নীতি গ্রহণ ও সে লক্ষ্যে কুদস দিবস ঘোষণার।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসলামী বিশ্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

"আমার বয়স ১৮ মাস তোমরা আমাকে ভুলে যেও না।" এ হলো যায়নবাদী ইয়াহূদি সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ মৃত্যু পথযাত্রী এক ফিলিস্তিনি শিশুর করুণ আকুতি।

এরকম হাজার হাজার নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশু তাদের আবেগী বার্তা পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। জুলুমবাজ স্বৈরাচারী ইয়াহূদিদের আক্রমণে নিহত ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ইতোমধ্যে ৩৮০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

এরা ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসী। এরা মুসলমান। এরা বায়তুল মুকাদ্দাসের ভাগ্যবান মুসল্লী ও প্রতিবেশী। আন্তর্জাতিক

ইয়াহূদি-খৃষ্টান চক্রের বিষাক্ত কুটনীতির ফলশ্রুতিতে তারা আজ নিজ দেশে পরবাসী। জন্মগত ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও তারা আজ অবরুদ্ধ-পরাধীন।

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত। মানবতা বিপর্যস্ত। মুহূর্মুহ গোলার শব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস প্রকম্পিত। চারিদিকে বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচীৎকার। এই নিদারুন পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্বের সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী প্রযোজ্য হচ্ছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের এমন এক করুণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্যে যারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ- যার অধিবাসী জালিম, এটি থেকে বের করে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যান এবং আপনার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করুন এবং আপনার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করুন।" (সূরা নিসাঃ ৭৫)

ফিলিস্তিন-ইসরাইলের এই যুদ্ধ মূলত জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা সাফ্‌ফঃ ৪)

ঈমান ও ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়া। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী (স.) বলেছেন-

اَلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

"সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়। যার মাথা ব্যথা পেলে পুরো শরীর ব্যথিত হয়, চক্ষু ব্যথিত হলে পুরো শরীর ব্যথিত হয়।" (সহীহ বুখারী ঃ ৬০১১)

ফিলিস্তিনে স্বাধীনভাবে বসবাস করা এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে স্বাধীনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার। বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকাংশ নবী-রাসূলের তীর্থ স্থান। একমাত্র মুসলমানরাই সকল নবী রাসূলকে (স.) হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন সেটির প্রতি এবং

যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন সেটির প্রতি ঈমান আন। কেউ যদি কুফরী করে আল্লাহ্‌র বিষয়ে, তাঁর ফেরেশতাদের বিষয়ে, তাঁর রাসূলগণের বিষয়ে এবং শেষ দিবস বিষয়ে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে" (সূরা নিসা ঃ ১৩৬)।

মুসলমানগণ মহান আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাদের বিশ্বাসের বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

"রাসূল ঈমান এনেছেন তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সেটির প্রতি এবং ঈমান এনেছে মুমিনগণও। তাদের সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। এবং তারা বলে- আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন আপনারই নিকট।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত সকল সম্প্রদায় নিজেদেরকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর অনুসারী দাবি করতে গর্ববোধ করে। কিন্তু, মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ই তাঁর প্রকৃত অনুসায়ী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

নিশ্চয় সে সকল মানুষই ইব্‌রাহীম (আ.) এর ঘনিষ্ঠতর যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৮)

বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের পবিত্র কেবলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) ১৬/১৭ মাস এটিকে কেবলা বানিয়ে নামায আদায় করেছেন। উপরন্তু এই বায়তুল মুকাদ্দাসেই তিনি মিরাজের রজনীতে সকল নবী-রাসূলের ইমাম হয়ে নামায আদায় করেছেন। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনায় মুসলমানরাই বায়তুল মুকাদ্দাসে ইবাদত-বন্দেগী করায় এবং এর তত্ত্বাবধানের অগ্রাধিকারী।

এতটা শক্তিশালী যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে ভরা কুটনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনবাসী আজ ইসরাইলি ইয়াহুদিদের নিকট পরাধীন। মুসলমানদের ঈমান, ইয়াকীন ও বিশ্বাসত্তে কাছে ইয়াহুদিদের এই আগ্রাসন ও শক্তিমত্তা একেবারেই ঠুনকো ও সাময়িক। তারা পরাজিত হবে অবিলম্বে। জন্ম-জন্মান্তরের লাঞ্ছনাই তাদের পরিণতি। মহান আল্লাহ্ বলেন-

ইসরাইলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত গাজা

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

"আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হবে। তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। সেটি এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তা এজন্যে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করত।" (সূরা আলে ইমরান: ১১২)

ইয়াহুদিদের বারে বারে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবার ঘটনাগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে ইসরাইলিরা

যে ড্রোন হামলা করেছিল তা ইরানের রাষ্ট্রীয় সীমানায় প্রবেশের পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাদের এ সময়ের লাঞ্ছনা রূপে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

যায়নবাদীদের লাঞ্ছনা চিরকালের জন্যে। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছনা চূড়ান্তরূপ লাভ করবে ইমাম মাহদী (আ.) এর যুগে। তখন মুসলামনদের বিরামহীন আক্রমণে জীবন বাঁচানোর জন্যে তারা গাছ-গাছালি ও ইট পাথরের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করবে। গাছ-গাছালি ও ইট পাথর তখন মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে يَامُسْلِمُ يا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ "ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এই যে, এখানে একজন ইয়াহূদি আমার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। তুমি তাকে খুন করে ফেল।" (বুখারী: ২৯২৬)

ফিলিস্তিনীদেও দুর্দিনে ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী (রহ.) এর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে তাদের পাশে রয়েছে। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গৌণ বটে। সুখের বিষয় এই যে, কতক অমুসলিম দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীতার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের প্রায় ১৩৯টি রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের সুস্পষ্ট সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক আদালত ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযে-াগ এনেছে এবং তাকে গ্রেপ্তারে সমন জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হামাস যোদ্ধা

এ সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা আরো জোরদার হওয়া উচিত। এতে সরকার ও জনগণ উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের জন্য এ মুহূর্তে যা করা যেতে পারে-

- মুসলিম জনগণ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিছিল ও মানববন্ধন করে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করবে এবং নিজ নিজ সরকারকে আরো জোরালো ভূমিকা পালনে চাপ সৃষ্টি করবে। তবে, জনগণ এমন কোনো কাজ করবে না যাতে নিজ দেশের আইন-শৃংখলার অবনতি হয়।
- দেশীয় আইন মেনে তারা ফিলিস্তিনিদের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী এবং চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করে বৈধ পথে তাদের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।
- মুসলিম বিশ্বের সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানগণ জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবে।
- রাষ্ট্র ও সরকার বৈধ চ্যানেলে ফিলিস্তিনিদের জন্যে অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবে।
- আন্তর্জাতিক আইন মেনে অস্ত্র সরবরাহের চেষ্টা করবে।
- মুসলিমদের আন্তর্জাতিক ফোরাম ওআইসি কে সর্বশক্তি নিয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কাজ করতে হবে।
- ফিলিস্তিনের সক্রিয় জিহাদি সংগঠনগুলো তথা হামাস, হিযবুল্লাহ্ ও ইসলামী জিহাদকে নিজেদের মধ্যে আরো সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন করতে হবে।
- সমস্যা সমাধানে সশস্ত্র প্রতিরোধের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ফোরামে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।
- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ দুআ হলো মুমিনের হাতিয়ার (মুস্তাদরাক হাকিম ঃ ১৮১২)।

মজলুম ফিলিস্তিনিদের বিপদমুক্ত স্বাধীন জীবনের জন্যে প্রত্যেক মুসলমানকেই দয়াময় আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতে হবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিজনগণের জন্যে চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ "এবং তিনি তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের কাংঙ্খিত আরো একটি বিষয় তা হলো আল্লাহ্র সাহায্য ও বিলম্বহীন বিজয়। হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।" (সূরা সাফফ ঃ ১৩)

ফিলিস্তিন স্বাধীন হবেই- ফিলিস্তিনীদের বিজয় আসবেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ হাফেজ।

লেখক: প্রধান খতীব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি দখলদারিত্বের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাশিদুল ইসলাম

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ফিলিস্তিনে জন্ম নিয়েছিলেন ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), যাকারিয়া (আ.) ও ঈসা (আ.)সহ অনেক নবী ও রাসুল। ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী দেশ জর্ডানে জন্মগ্রহণ করেন নূহ (আঃ), লূত (আ.) ও আইউব (আঃ)। আরেক প্রতিবেশী দেশ লেবাননে জন্ম নেন সালেহ (আ.)। মিশরে জন্ম নেন মুসা (আ.), হারুন ও শুয়াইব (আ.)। ইয়াকুব (আ.)এর বংশধরেরা খ্রিস্টপূর্ব তেরোশ বছর ধরে ফিলিস্তিন শাসন করতেন। দাউদ (আ.) তার শাসনামলে জেরুজালেমে বায়তুল আকসা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। আর তার পুত্র সুলায়মান (আ.) নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এ মসজিদেই মিরাজের রজনীতে সকল নবীর আগমন ঘটেছিল। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (স.)এর ইমামতিতে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দাউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর ফিলিস্তিনের শাসন-ভার গ্রহণ করেন তারই পুত্র সুলাইমান (আ.)। এসব কারণেই ফিলিস্তিন, জেরুজালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলিম বিশ্বে পূণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত।

তবে ফিলিস্তিনের বর্তমান এই অবস্থার সূচনা কিভাবে হলো তা জানতে প্রথমেই আমাদের অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিকে কিছুটা নজর দিতে হবে। কারণ অটোমান সাম্রাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনের অনেক পরিবর্তনের ইতিহাস। বহু জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের মিলিত রূপ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য। ২০ শতাংশ অধিবাসী ছিল খ্রিস্টান, ৫ শতাংশ ছিল ইহুদি। প্রতিবেশী ঔপনিবেশিক দেশগুলোর তুলনায় অটোমান সাম্রাজ্যেধর্মীয় সহনশীলতা ছিল অনেক বেশি। আশপাশের দেশগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক অস্থিরতার সময় বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষরা নিশ্চিন্তে নিরাপদে অটোমান সাম্রাজ্যে এসে শান্তির নীড় খুঁজত। কৃষিভিত্তিক সমাজ আর এ সমাজের স্থিতিশীলতার মাঝে অটোমান সাম্রাজ্যে শাসকরা কখনো ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। চমৎকার এক শাসনব্যবস্থা ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি বিকেন্দ্রীকরণ। স্থানীয় মানুষরা গর্ভনিং কাউন্সিলে অংশ নিয়ে পুরোপুরি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখত। তারাই শাসন চালাত। কর সংগ্রহ ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিকেন্দ্রীকরণ। কর আদায়ের অধিকার কিনে নিত কেন্দ্রীয় শাসকদের কাছ থেকে। নির্ধারিত হারে একটি নিয়মের ভিতর থেকে স্থানীয় কর সংগ্রাহকরা কর আদায় করতেন। অটোমান সাম্রাজ্যের মানুষরা ছিল সুখী। ইস্তাম্বুলের আরেক নাম ছিল 'দি সাদাত' মানে 'সুখের আবাস'।

তুরস্ক সবধর্মের মানুষের জন্যে এতই আগ্রহের দেশ ছিল যে, কোথাও কেউ নিপীড়িত হলে, অত্যাচারিত হলে তুরস্কে এসে আশ্রয় নিত। জার্মানিতে নির্যাতিত ইহুদি রাবাই আইজাক জারফেদি তার ইহুদি ভাইদের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, "অটোমান সাম্রাজ্যে এসে শান্তিতে বসবাস কর"।

এ বিষয়ে বিখ্যাত এক ছবি আছে, সেখানে দেখা যায় বিশাল বিশাল পালতোলা নৌকায় ইহুদিরা তুরস্কে আসছে এবং আইজাক জারফেদি তাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। অটোমান সাম্রাজ্যে তাহলে কখন থেকে ইহুদি বসতি স্থাপন শুরু হলো? পনের শতক থেকেই স্পেন হতে অটোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা আসতে থাকে। ক্যাথলিক চার্চের করা আইনী কাঠামো অনুসারে অ-খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়া হতো। ব্লাসফেমির শিকার হতো মুসলমান ও ইহুদিরা। একে বলা হতো ইনকিউজিশন। পনের শতকে ইনকিউজিশনের মাধ্যমে ইউরোপে ইহুদি ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তখন অটোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের গ্রহণ করার একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। কারণ মুসলমান ও ইহুদি উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।

কিন্তু আঠারো শতকে ফিলিস্তিনের অবস্থা কেমন ছিল? ফিলিস্তিনে তখন ৮৫ শতাংশ ছিল মুসলিম, ১০ শতাংশ খ্রিস্টান ও ৫ শতাংশ ইহুদি। এরা সবাই অটোমান সাম্রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করত। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সব ধর্মের একটা পবিত্র স্থান থাকায় আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেত এ এলাকাটি। এসব পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রীরা আসত। পর্যটক, মিশনারীরা আসত। ফিলিস্তিনের ভাষা ছিল আরবী। তারপরও কায়রো, দামেস্ক ও বৈরুতের সংস্কৃতি ফিলিস্তিনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ জীবন ছিল কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর। এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ফিলিস্তিনিদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ। ফিলিস্তিনে তখন সাড়ে ৪ লাখ

জনগোষ্ঠীর ৭৫ শতাংশই ছিল কৃষক। মোট জনসংখ্যার প্রায় চারভাগের তিনভাগ কৃষক। ৭শ গ্রামে ছিল তাদের বসবাস। গ্রীষ্মে তারা চাষ করত ফল, সবজী, সিম ও ডাল। হেমন্তে জলপাই আর বসন্তে গম ও বার্লি। ফিলিস্তিনের ভূমি ছিল খুব উর্বর। আর গম ছিল অর্থকরী ফসল। জায়নবাদীরা মনে করত বিশ্বে দুইটি উর্বর ভূমি রয়েছে। একটি ফিলিস্তিন, আরেকটি আর্জেন্টিনা। এ দুটি স্থানই ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে বেছে নেয়া হয়। অটোমান সাম্রাজ্যে সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল জমির মালিকানায়। উনিশ শতকের আগে ফিলিস্তিনে জমির মালিকানা ছিল সামাজিক। কোনো ব্যক্তি জমির মালিক ছিল না। মালিক ছিল সমাজ। সবাই যেনো ধারাবাহিকভাবে ঘুরে ফিরে ভাল জমিতে আবাদের সুযোগ পায় সেজন্যে ২/১ বছর পর পর জমি নতুন করে বিতরণ করা হত। যাতে সবাই জমিতে ফসল ফলানোর সুযোগ পায়। এরই মধ্যে ঘটল মারাত্মক অঘটন। সারা ইউরোপে ঘটে যাওয়া শিল্পবিপ্লব নিয়ে এল জাতীয়তাবাদের তীব্র আকাঙ্খা। কৃষির জন্যে যে স্থিতিশীল সমাজ তৈরি হয় তাতে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয় এই জাতীয়তাবাদের প্রভাব। কৃষক জমির কাছে থাকতে পারল না। কলকারখানা বা শহর পানে ছুটতে লাগল। ভূমিদস্যুর উত্থান ঘটলো; তাদের থাবা পড়লো কৃষকের জমিতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে কৃষক বা কৃষি শ্রমিক একই জমিতে কাজ করেছে তাদের স্থানান্তরিত করা হল সুকৌশলে। শিল্পের জন্যে চলমান শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাতে অনেক কৃষক উন্নত আয়ের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে বা শিল্পকারখানায় ছুটতে লাগল। অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ গ্রিসে জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে উসকানি দিল ইংল্যান্ড। গ্রিসের কৃষিভিত্তিক সমাজকে ভাঙার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তা করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে বলকান অঞ্চলের সার্বিয়াকে হারালো অটোমান সাম্রাজ্য। গ্রিসকে হারালো ১৮৩০ সালে। রোমানিয়াকে ১৮৭৮ সালে, ১৮৩০ সালে আলজেরিয়াকে হারালো ফ্রেঞ্চদের কাছে। ১৮৮১ সালে তিউনিশিয়া হাতছাড়া হলো ফ্রেঞ্চদের কাছে। শিল্পায়িত ইউরোপ এভাবেই অটোমান সাম্রাজ্যকে খুবলে খুবলে খেতে শুরু করল। অটোমানের এসব অঞ্চল ইউরোপের কলোনী বা নয়া আশ্রিত উপনিবেশে পরিণত হলো।

ফিলিস্তিনের দুর্দশার একটা শর্ত লুকিয়ে আছে একের পর এক অঞ্চল হারিয়ে অটোমান কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাল তার ওপর। অটোমানরা দেখল তাদের ডিসেন্ট্রালাইজড ব্যবস্থা সেন্ট্রালাইজড করতে হবে। তারা ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনল। ১৮৫৮ সালে তারা সম্পত্তির মালিকানায় মৌলিক পরিবর্তন এনে ঠিক করল সমাজ না, ব্যক্তিকে জমির রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এতে অনেকে জমির মালিক বনে যাবে। তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটা সরাসরি সম্পর্ক হবে এবং অনেক বেশি কর আদায় হবে। ফল হলো উল্টো। ১৯১৮ সালে মাত্র আড়াইশ পরিবার ফিলিস্তিনের ৫০ শতাংশের বেশি জমি সমাজের কাছ থেকে কিনে নিল। এতে তার আগের সমাজ ব্যবস্থা ঠিক থাকল। কারণ যারা জমির নতুন মালিক হলো তারা ফিলিস্তিনে থাকত না। কেউ কেউ থাকতো। কেউ থাকত ইউরোপে, ফ্রান্সে। স্বাক্ষরের বিনিময়ে কৃষকরা কিছু টাকা পেল জমির নতুন মালিকের কাছ থেকে, জমি চাষ কৃষকরা আগের মতোই করতে লাগল। মালিকানা পরিবর্তন হয়ে সামান্য কিছু মালিকের হাতে জমি চলে গেলেও কৃষকরা আগের মতোই চাষ করতে পেরে খুশী। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকও ছিল না। রাজার কাছে রেজিস্ট্রেশন করে কিছু সময়ের জন্যে চাষাবাদের সুবিধা পেত। আইন ও প্রশাসনিক কাজে জড়িয়ে যাওয়া কৃষকরা পছন্দ করত না। যুদ্ধের সময়ে জমি রেজিস্ট্রেশনের তালিকা ধরে যুদ্ধে যোগ দিতে ডাক আসত। রাজার কাছে জমির মালিক হিসেবে নাম না থাকায় তারা খুশী ছিল। ঝামেলা মনে করত এটিকে। কিন্তু এটাই হয়ে উঠল ফিলিস্তিনের সর্বনাশ। ফিলিস্তিনের শহরে যারা বাস করত তারা ছিল শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আমলা, ধর্মীয় নেতা বা অন্য পেশার মানুষ। বেশিরভাগ জমির মালিকানা ছিল এদের। এদের আবার পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ছিল ফিলিস্তিনের। গম, যব, তুলা, কমলা, বার্লি রফতানি অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল। কিছুটা অর্থ আসত পর্যটন থেকে। সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল চমৎকার সম্পর্ক। সবধর্মের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করত। একই রাস্তার পাশাপাশি বাস করত। একই দোকান থেকে পণ্য কিনত। সব ধর্মের শিশুরা একসঙ্গে খেলাধূলা করত। জেরুজালেমের আল-ওয়াদ এলাকায় ৩টি চার্চ, ৩টি সিনাগগ আর ৭টি মসজিদ ছিল। মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদিরা পরস্পরের উৎসবে অংশ

নিত। ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে প্রোগ্রম নামে পরিচিত আক্রমণে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হলো। বিশ লাখ ইহুদি আমেরিকায় আর ৩০ হাজার ইহুদি আশ্রয় নিল ফিলিস্তিনে। এক লাখ ইহুদি তাদের জীবিকা হারাল। রাশান জার আলেকজান্ডার দি সেকেন্ডকে হত্যার জন্যে ইহুদিদের দায়ী করা হলো। ওয়ারশ, ইউক্রেন, পোল্যান্ড ও রাশিয়ায় শত শত বিভৎস প্রোগ্রম সংঘটিত হলো এবং হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়। এরা ছিল রাশিয়ায় জার শাসনে থাকা মোট ইহুদির ৫ শতাংশ। কিন্তু অটোমানরা জমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালুর সময় ফিলিস্তিনের যেসব জমি কিনে নেয় অনাবাসি ধনীরা আর এদের কাছ থেকে জমি কিনে নিতে শুরু করে ইহুদিরা। ১৯০০ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে ৫ হাজার ইহুদি বসবাস শুরু করে উপকূলীয় সমভূমি ও গ্যালিলিতে। জাফা, হাইফা, জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ইহুদিরা জমি কিনে বসবাস করতে শুরু করে। ১৯১৪ সালের মধ্যে ইহুদি অভিবাসীরা যে জমি কিনেছিল তার ৫৮ শতাংশের মালিক ছিল যারা ফিলিস্তিনে বাস করত না। ফিলিস্তিনে অনুপস্থিত জমির মালিকদের কাছ থেকে ইহুদিরা দেদারছে জমি কিনতে শুরু করল। ততদিনেও ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারেনি কি ঘটতে যাচ্ছে। ১৯০৪ সালের আগ পর্যন্ত ইহুদিরা ফিলিস্তিনে কোনো কৃষি কাজ করেনি। কারণ ওই ইহুদি অভিবাসী-রা কৃষক ছিল না। কৃষি কাজে তারা অভিজ্ঞ ছিল না। এসব ইহুদি মূলত হোয়াইট কালার জব করত। ব্যাংকার, শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এধরনের পেশার মানুষ। তাই তারা স্থানীয় ফিলিস্তিনি কৃষকদের নিয়োগ দিয়েছিল কৃষি কাজ করার জন্যে। অভিজ্ঞ ফিলিস্তিনি কৃষকরা ভাল ফসল ফলাতে পারত। তখনো কোনো সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়নি। কারণ আগেও যে জমি চাষ করত মালিকানা পরিবর্তনের পরেও পূর্বের কৃষকরা জমি চাষ করত। সমস্যা শুরু হলো ফিলিস্তিনে যখন দরিদ্র ইহুদিরা আসতে শুরু করে তখন থেকে। ১৮৩০ সাল থেকে দরিদ্র ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। তখন জমির ইহুদি মালিকরা ফিলিস্তিনি কৃষকদের বলে দরিদ্র ইহুদিদের জমি ছেড়ে দিতে। রাতারাতি ফিলিস্তিনিরা উচ্ছেদ হতে শুরু করল। যারা আজীবন ওসব জমিতে চাষ করে আসছে তারাই জমি হারাতে লাগল ঠিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপূরুষরা কোলকাতার জমিদার শ্রেণীর কাছে যেভাবে জমি হারিয়েছিল। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ওয়াদি আল হাওয়ায়িদ, মারজ ইবনে আমির থেকে ৮ হাজার ফিলিস্তিনিকে ঘার-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৩টি ফিলিস্তিনি গ্রাম জনশূণ্য করা হয়। ইসরাইল নামে অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকে ফিলিস্তিনিদের তাদের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ শুরু হয়। ১৮৮৭ সালে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা কাত্রা/গেডেরার একটি আরব গ্রামের সব চারণভূমি একজন অনুপস্থিত ফরাসি মালিকের কাছ থেকে কিনে নেয়। ওই গ্রামের সব ফিলিস্তিনি বাসিন্দাা ছিল পশুপালনকারী। চারণভূমি না থাকলে তারা পশুপালন কিভাবে করবে। জীবিকা ও জমি হারিয়ে ফিলিস্তিনিরা প্রথম প্রতিবাদ শুরু করে। এরপর ১৮৯২ সালে একই ঘটনা ঘটে রেহোভট এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম জারনুকা এবং পরে সুটেরিয়া বেদুইন উপজাতির বাসিন্দাদের পশু চরানোর জায়গা বন্ধ করে দেয়ায়। অনিবার্যভাবে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে গ্যালিলিতে জায়নবাদিরা বসবাসকারী আরবদের সরিয়ে দেয়। এর ফলে সহিংসতা আরো ছড়িয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অনেক আগে থেকেই ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের অনেক আগে থেকে অটোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা আরবদের ঘিরে বসতে থাকে।

এরপরও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ্য হতে থাকে ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে বসবাসকারী ইহুদিরা যে ব্যাপক বিদ্বেষ-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তার জন্যে ফিলিস্তিনিরা মোটেও দায়ী ছিল না। কিন্তু সেখান থেকেই 'যায়নিজম' বা 'ইহুদিবাদী' আন্দোলনের শুরু। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের বাইরে কেবলমাত্র ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র পত্তন করা। ইহুদিবাদী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসতি গাড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই অভিবাসন স্থানীয় আরব এবং মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে। সেসময় আরব এবং মুসলিমরাই ছিল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য কার্যত ভেঙে পড়ে। তখন যে 'লিগ অব নেশন' গঠিত হয়েছিল, সেই বিশ্ব সংস্থার পক্ষ থেকে ব্রিটেনকে 'ম্যান্ডেট' দেয়া হয় প্যালেস্টাইন শাসন করার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন ব্রিটেন আরব এবং ইহুদি, উভয় পক্ষের

কাছেই নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্যালেস্টাইন নিয়ে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনটিই ব্রিটেন রক্ষা করেনি। পুরো মধ্যপ্রাচ্য তখন কার্যত ভাগ-বাটোয়োরা করে নিয়েছিল ব্রিটেন আর ফ্রান্স। এই দুই বৃহৎ শক্তি পুরো অঞ্চলকে তাদের মতো করে ভাগ করে নিজেদের প্রভাব বলয়ে ঢোকায়।

প্যালেস্টাইনে তখন আরব জাতীয়তাবাদী এবং ইহুদিবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। ইহুদি এবং আরব মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্যালেস্টাইন ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। এদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যার ধুয়া তুলে (হলোকাস্ট) ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় চাপ সৃষ্টি করা হয়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলটি তখন ফিলিস্তিনি আর ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইল নামে আজকের অবৈধ ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটি।

কিন্তু পরদিনই মিশর, জর্দান, সিরিয়া এবং ইরাক মিলে অভিযান চালায় ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলে। সেটাই ছিল প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ইহুদিদের কাছে এটি স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনে আরবদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে অঞ্চলটি বরাদ্দ করেছিল, এই যুদ্ধের পর তার অর্ধেকটাই চলে যায় ইসরাইল বা ইহুদিদের দখলে। ফিলিস্তিনের জাতীয় বিপর্যয়ের শুরু সেখান থেকে। একেই বলা হয় 'নাকবা' বা বিপর্যয়। প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনিকে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে হয়। ইহুদিবাদী বাহিনী তাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ করে। আরব আর ইসরাইলদের মধ্যে এটা ছিল দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের সূচনা মাত্র।

১৯৫৬ সালে যখন সুয়েজ খাল নিয়ে সংকট তৈরি হয়, তখন ইসরাইল মিশরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই সংকটে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ব্রিটেন, ইসরাইল আর ফ্রান্সকে পিছু হটতে হয়। ফলে যুদ্ধের মাঠ কোনো কিছুর মীমাংসা সেই সংকটে হয়নি। এরপর এলো ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ৫ই জুন হতে ১০ই জুন পর্যন্ত এই যুদ্ধে যা ঘটেছিল, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল পরবর্তীকালে। ইসরাইল বিপুলভাবে জয়ী হয় এই যুদ্ধে। তারা গাজা এবং সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয় যা কিনা ১৯৪৮ সাল হতে মিশরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে, পূর্ব জেরুসালেম-সহ পশ্চিম তীরও ইসরাইল দখল করে নেয় জর্দানের কাছ থেকে। সিরিয়ার কাছ থেকে দখল করে গোলান মালভূমি। আরও পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়ি-ঘর ফেলে পালাতে হয়।

আরব-ইসরাইল সংঘাতের ইতিহাসে এর পরের যুদ্ধটি 'ইয়োম কিপুর' যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের এই যুদ্ধের একদিকে ছিল মিশর আর সিরিয়া, অন্যপক্ষে ইসরাইল। মিশর এই যুদ্ধে সিনাই অঞ্চলে তাদের কিছু হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে। তবে গাজা বা গোলান মালভূমি থেকে ইসরাইলকে হটানো যায়নি। এই যুদ্ধের ছয় বছর পর ঘটে সেই কুখ্যাত সন্ধি। মিশর প্রথম কোনো আরব রাষ্ট্র যারা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে। এর পর তাদের পথ অনুসরণ করলো জর্দান। কিন্তু তাই বলে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ শেষ হলো না। গাজা ভূখণ্ড যেটি বহু দশক ধরে ইসরাইল দখল করে রেখেছিল, সেটি ১৯৯৪ সালে তারা ফিলিস্তিনিদের কাছে ফিরিয়ে দিল। সেখানে ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বড় ধরণের লড়াই হয় ২০০৮, ২০০৯, ২০১২ এবং ২০১৪ সালে। ২০১৪ সালে গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি বোমা মেরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় ইসরাইল। প্রায় দুহাজারের বেশি মানুষ সেই যুদ্ধে শহীদ হন।

মধ্যপ্রাচ্যে কেন ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করা হয়?: ইহুদিরা বিশ্বাস করে বাইবেলে বর্ণিত পিতৃপুরুষ আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের জন্য যে পবিত্রভূমির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, আজকের আধুনিক ইসরাইল সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে অবশ্য এই ভূমি নিয়ে সংঘাত চলছে। আসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, পার্সিয়ান, মেসিডোনিয়ান এবং রোমানরা সেখানে অভিযান চালিয়েছে, সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। রোমানরা সেখানে 'জুডেয়া' বলে একটি প্রদেশ তৈরি করেছিল। তবে এই 'জুডেয়া' প্রদেশের ইহুদিরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেছে। রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের আমলে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট জাতীয়তাবাদী ইহুদি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। তিনি সেটি দমন করেন। এরপর তিনি জুডেয়া এবং রোমানদের অধীন সিরিয়াকে যুক্ত করে তৈরি করেন এক নতুন প্রদেশ, যার নাম দেয়া হয় সিরিয়া-প্যালেস্টাইন।

এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যায়। সেখানে ইহুদিদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়। অনেকে নির্বাসিত হয়। অনেক ইহুদিকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। ইসলামের উত্থানের পর অষ্টম শতকে প্যালেস্টাইন জয় করলো আরবরা। এরপর অবশ্য ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা সেখানে অভিযান চালায়। ১৫১৬ সালে এই এলাকায় শুরু হয় তুর্কি আধিপত্য। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি একটানা শাসন করেছে তারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লীগ অব নেশন্স প্যালেস্টাইন কে তুলে দেয় ব্রিটিশদের হাতে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন চলেছে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন ভাগ করার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনায় একটি আরব এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল আর জেরুসালেম নগরীর জন্য একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়। পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছিল ইসরাইল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিল আরবরা। এই পরিকল্পনাকে আরবরা দেখছিল তাদের ভূমি কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ওপর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার মাত্র একদিন আগে ইহুদিরা ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল। পরের দিনই ইসরাইল জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানালো, যা গৃহীত হলো এক বছর পর। জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৬০টি ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যদিকে, ১৪২টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

বাংলাদেশের জনমত ও গণমাধ্যমে ফিলিস্তিন

সিরাজুল ইসলাম

অন্তত ৭০ বছরের এক করুণ ইতিহাসের নাম ফিলিস্তিন। সেই যে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জবর দখলের মাধ্যমে ইহুদিবাদী ইসরাইল নামক একটি অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, দিনে দিনে তা ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য বিষফোড়ায় রূপ নিয়েছে। এর বীভৎস্যতা কালের পরিক্রমায় এতটাই বেশি হয়েছে যে, তা যেন পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ক্যান্সার হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। এর পচনে আরব ভূখণ্ড এখন মারাত্মকভাবে বিষাক্ত।

ইসরাইলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজা

এই পচনশীল ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এবং জিহাদ আন্দোলনসহ কতকগুলো প্রতিরোধকামী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা ফিলিস্তিনি জনগণকে বহু দশক পর মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে জীবনবাজি রেখে চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে দখলদার ইসরাইলের ভিতরে ইতিহাসের বাঁকঘো-রানো সামরিক অভিযান চালানো হয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার হামাসের সাথে ইসরাইলের দখলদার বর্বর সেনাদের যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু এবারের যুদ্ধ ভিন্নতর। এর ধরণ ও গতি-প্রকৃতি আলাদা। ইসরাইল একটা প্রতিষ্ঠিত সামরিক শক্তি যার দখলে পরমাণু অস্ত্র পর্যন্ত রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তৎপরতায় তার একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাব ছিল। অঢেল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে তাদের কাছে। আসলে ইসরাইল তো কোনো রাষ্ট্র নয়, এটা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের একটি গ্যারিসন। ইসরাইল নামক অবৈধ এ রাষ্ট্রটি পশ্চিমা একটা ক্যান্টনমেন্ট। এটা গোলা-বারুদের একটা গুদাম। যতটা আয়তনে এই অবৈধ রাষ্ট্রের বিস্তার; সেই তুলনায় অস্ত্রের পরিমাণ অনেক বেশি। এই গ্যারিসন বা ক্যান্টনমেন্টের বিরুদ্ধে একেবারে সরাসরি অভিযান চালানো একদম সাধারণ কোনো বিষয় নয়। এটা মহা দুঃসাহসিক কাজ। সেই কাজ করেছে ফিলিস্তিনের হামাস ও জিহাদ আন্দোলনের সাহসী সন্তানেরা। ৭ অক্টোবরের অভিযান চালাতে তারা বাধ্য হয়েছে। প্রথমত- তাদের সামনে মাতৃভূমি উদ্ধারের প্রশ্ন রয়েছে, দ্বিতীয়ত- মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা উদ্ধারের বিষয় আছে। তৃতীয়ত- ইহুদিবাদীরা প্রতিদিন যেভাবে ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যা, নির্যাতন ও ধরপাকড় করে তা সভ্য সমাজে কল্পনা করা মুশকিল। এই হত্যা, নির্যাতন ও অপমান থেকে নিজেদের মুক্ত করার একটা দায়িত্ব ও চাপ আছে হামাস এবং জিহাদ আন্দোলনের ওপর। তাদের দিকে চেয়ে থাকে ফিলিস্তিনের অগণিত মানব সন্তান; যদি তারা মুক্তির দূত হয়ে আসে! এই দায়িত্ব পালনের ডাকে সাড়া দিয়ে হামাস ও জিহাদ আন্দোলনের যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর নজিরবিহীন অভিযান চালিয়েছে।

এবারের অভিযানে সম্ভবত একটা 'ডু অর ডাই' চেতনা কাজ

করেছে। চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্য নিয়েই মনে হয় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ভেতরে অভিযান চালিয়েছে। তাদের টিকে থাকার কৌশল ও অবস্থা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নয় মাসের বেশি সময় পার হয়েছে কিন্তু ইসরাইলের পক্ষে হামাসকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। বলতে গেলে, গাজা উপত্যকা থেকে কোনো বন্দীকে উদ্ধার করতে পারেনি ইসরাইল। গাজার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বর্বর ইহুদিবাদী সেনারা শুধুই বেসামরিক ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যা করেছে। এমনকি তারা ১৬ বছর অবরুদ্ধ থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কী করে এমনভাবে লড়াই করা সম্ভব হচ্ছে- সারা বিশ্বের কাছে তা এখন অপার বিস্ময়।

এবারের লড়াইয়ে পুরো বিশ্ব থেকে ফিলিস্তিনিরা দারুনভাবে সমর্থন পাচ্ছে। যেমন কূটনৈতিক সমর্থন রয়েছে, তেমনি জোরালো রাজনৈতিক সমর্থনও আছে তাদের পেছনে। সামরিক সমর্থনও কম নয়। লেবাননের হিজবুল্লাহ যেমন লড়ছে ফিলিস্তিনিদের জন্য, তেমনি লড়ছে ইয়েমেন ও ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি,

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে গাজা যুদ্ধ

গণহত্যা পর্যন্ত চালিয়েছে এবং সেই অপরাধ ঢাকতে তারা বহু হাসপাতাল চত্বরসহ বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দিয়েছে। কিন্তু সেসব অপরাধ ঢেকে রাখতে পারেনি দখলদাররা, সেগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ছে। গাজার হাসপাতাল চত্বর থেকে গণকবরের অনুসন্ধান পাওয়ার খবর আসছে প্রতিদিন।

আগেই বলেছি- এবার হামাস ও জিহাদ আন্দোলনের লড়াই দেখে মনেই হচ্ছে তারা ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার সংগ্রামে নেমেছে। এজন্য তাদের আছে দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি। পাশাপাশি সক্রিয় আছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক তৎপরতা। এত অবরোধ, এত হত্যাযজ্ঞ- তারপরেও ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা টিকে আছে, লড়ছে সমান তালে। হামাস ও জিহাদ আন্দোলনসহ ফিলিস্তিনি বিভিন্ন প্রতিরোধকামী সংগঠন এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হয়েছে মুক্তির এ লড়াইয়ে। নয় মাস পেরিয়েছে সে লড়াই। যেখানে ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মাত্র ছয়দিনে বলা যায় পুরো আরব বিশ্বকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল ইসরাইল, সেখানে ফিলিস্তিনের কয়েকটি সংগঠন (প্রধানত গাজাভিত্তিক) আজ নয় মাস লড়ছে পশ্চিমাদের ক্যান্টনমেন্ট ইসরাইলের সাথে। শুধু লড়ছে না বরং ময়দানে ভালোভাবেই টিকে আছে কিন্তু দখলদার ইসরাইল গাজার যোদ্ধাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেনি।

বাহরাইন থেকে ইসরাইলের ওপর হামলা চালিয়েছে আল-আশতার নামে একটি সংগঠন। এটিও নজিরবিহীন ঘটনা। মধ্যপ্রাচ্যের নতুন সমীকরণ বিন্যাসে এ সংগঠনটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

গাজা-ইসরাইল যুদ্ধের অবস্থা যখন এমন তখন সারা বিশ্ব থেকে গণমাধ্যমেও ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছে। বেশিরভাগ গণমাধ্যম পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব-বলয়ে থাকার পরও ফিলিস্তিন প্রশ্নে এবার গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা ভিন্ন রকম। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের গণমাধ্যমও এর বাইরে যেতে পারেনি বা যায়নি। গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছে দেশের গণমাধ্যমগুলোতে। বাংলাদেশের জনমতকেই মূলত গণমাধ্যম ধারণ করেছে, লালন করছে।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: সবচেয়ে বড় যে সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তা হলো- আগে যেখানে পশ্চিমা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে হামাস ও জিহাদ আন্দোলনকে সন্ত্রাসী বলা হতো, সেখানে এখন তাদেরকে ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তির দূত হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের বদলে এখন হামাস ও জিহাদ আন্দোলনের যোদ্ধাদেরকে "প্রতিরোধ যোদ্ধা" কিংবা ফিলিস্তিনের "মুক্তিযোদ্ধা" অথবা "স্বাধীনতাকামী" বলা হচ্ছে। এটা বড়

রকমের পরিবর্তন এবং হামাস ও জিহাদ আন্দোলনের প্রতি জোরালো নৈতিক সমর্থন। বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদেরকে নিপীড়িত জনগণের মুক্তির কাণ্ডারি বলেই তুলে ধরছে।

গত ৭ অক্টোবর ইহুদিবাদী ইসরাইলের পক্ষ থেকে গাজায় আগ্রাসন শুরুর পর বাংলাদেশের গণমাধ্যম বেশ দ্রুতই ফিলিস্তিনের পক্ষে নানা ধরনের খবর, মতামত, কলাম ও মন্তব্য প্রতিবেদন, বিভিন্ন ধরনের কার্টুন এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেমন- বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো নানামুখী খবর ও তথ্য পরিবেশন করে চলেছে যার বেশিরভাগ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে যায়। বাংলাদে-শর একমাত্র নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুসের একটি বক্তব্য গত ২৩ অক্টোবর প্রথম আলো প্রকাশ করেছে। এই খবরের শিরোনাম দেয়া হয়েছে- "স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ: ড. ইউনূস"। এই খবরে ডক্টর ইউনূসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ। কোন রকমের দেরি কিছুতেই আর গ্রহণযোগ্য নয়।"

এ পত্রিকার আরো বহু সংখ্যক শিরোনাম রয়েছে। যেমন ৪ দশকের মধ্যে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল সম্পর্কে ফাটল, গাজায়

ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঢাকায় বিক্ষোভ

নিহত ৩৫০০০ ছাড়ালো, রাফায় ইসরাইলি আক্রমণে হামাস নির্মূল হবে না: ব্লিংকেন ইত্যাদি। আরো শিরোনাম হলো- "গাজার আল-শিফা হাসপাতালে আরেকটি গণকবর থেকে ৪৯ লাশ উদ্ধার।" "যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইসরাইলকে আর ছাড় দেবে না হামাস" এবং "যুদ্ধবিরতির শর্তে রাজি হামাস, কি করবে ইসরাইল? " এমন শিরোনামও প্রথম আলো করেছে।

দৈনিক প্রথম আলো লাল ব্যানার হেডে একটি বিভাগ খুলেছে যেখানে শিরোনাম দেয়া হয়েছে- 'রক্তাক্ত ফিলিস্তিন'।

এই বিভাগে ইসরাইলের আগ্রাসন, ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ, ইসরাইলকে কারা কত অস্ত্র দেয়, গাজায় ইসরাইলের নৃসংশতা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকার আরেকটি শিরোনাম এমন- গাজায় নৃশংসতার প্রতিবাদ: যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে চড়াও পুলিশ, হার্ভার্ডে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার।

দৈনিক প্রথম আলো গত ৯ মে একটি বাইলাইন স্টোরি করেছে যার শিরোনাম- "ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি অনন্য সংহতি"। সেখানে একটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যার ক্যাপশনে জানানো হয়েছে- ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে ব্যানার হাতে সেগুনবাগিচায় সরকারি কার্যালয়ে কর কমিশনার সামিয়া আক্তার, উপর কমিশনার রকিবুল হাফিজ ও জহিরুল ইসলাম ফিলিস্তিনের পতাকার রঙের সঙ্গে মিল রেখে পোশাক পরেছেন।

এই তিন কর্মকর্তা যে ব্যানার নিয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন তাতে লাল, কালো এবং সবুজ রঙের আরবি হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মূলত করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের পতাকার রঙের সাথে মিল রেখে। তিনটি আরবি লাইনের পাশাপাশি তিনটি ইংরেজি লাইনে একই বক্তব্য দেয়া হয়েছে। ব্যানার লেখা হয়েছে 'Oh Allah help the believers in Palestine."

এদিকে, ডেইলি স্টার বাংলাও ফিলিস্তিন, গাজা এবং ইসরাইল নিয়ে নানামুখী খবর ও মন্তব্য প্রতিবেদন ছেপে চলেছে। তাতে নানামুখী তথ্য ও প্রতিবেদনও ছাপা হচ্ছে। এই পত্রিকাতে একটি শিরোনামে হামাস কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। শিরোনামে বলা হয়েছে- কে এই আল-আকসা ফ্লাডের মাস্টারমাইন্ড মোহাম্মদ দেইফ?

আরেকটি শিরোনাম- যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় হামাস, গাজায় তাদের ভূমিকা কি। পত্রিকাটি আরো শিরোনাম করেছে- ইসরাইলের কারাগারে কত ফিলিস্তিনি বন্দী। গাজায় চার সমস্যার মুখে পড়তে পারে ইসরাইল; যেভাবে ইসরাইলের গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিল হামাস-এটা আরেকটি শিরোনাম। ডেইলি স্টার বাংলার আরেকটি আকর্ষণীয় শিরোনাম- "স্বাধীন ফিলিস্তি-নের সমর্থক ভারত যেভাবে ইসরাইলের বন্ধু হলো।" পত্রিকাটির আরেকটি শিরোনাম- ভারত থেকে কেন ফিলিস্তিন বিরোধী মিথ্যা প্রচারণা চলছে। পত্রিকার মতামত কলামে গোলাম মর্তুজা একটি দীর্ঘ গন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছেন যার শিরোনাম- জীবন কেন ফিলিস্তিনিদের নয়। এর প্রারম্ভিক বক্তব্যগুলো এমন- "ইসরাইলি বোমায় ক্ষতবিক্ষত সাদা কাপড়ে মোড়ানো ফিলিস্তিনি শিশুর ছবি বা আর্তচিৎকারে কি জাগবে না বিশ্ব বিবেক? মানবিক বিপর্যয়, মানবাধিকারও কি নির্ধারিত হবে ধর্ম বর্ণের আবরণে? এই মন্তব্য প্রতিবেদনে ইসরাইলের বর্বরতা, নির্মমতা, নিপীড়ন, দখলদারিত্ব

সমস্ত বিষয়ই চমৎকারভাবে ফুঠে উঠেছে।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার একটি শিরোনাম হলো- ফিলিস্তিন ইস্যুতে পশ্চিমা গণমাধ্যম কেন পক্ষপাতদুষ্ট? মইনুল ইসলাম লিখেছেন এই কলাম। সামাজিক মাধ্যমে ৬৯ বার শেয়ার হয়েছে কলামটি।

গাজা-ইসরাইল যুদ্ধ নিয়ে এসব খবর ও বিশ্লেষণ অনলাইন ভার্সনে প্রকাশ হলে তাতে বহুসংখ্যক পাঠক নানা রকম মন্তব্য করছেন। এসব মন্তব্যের বেশিরভাগই ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে যায়। পাঠকদের এইসব মন্তব্য মূলত ফিলিস্তিনিদের প্রতি বাংলাদেশের গণমানুষের গভীর আবেগ-অনুভূতি ও জোরালো সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলা ট্রিবিউন একইভাবে নানামুখী খবর, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য প্রকাশ করেছে। এই পত্রিকার একটি শিরোনাম- "বাংলাদেশের জনগণ ফিলিস্তিনের পক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

দৈনিক প্রথম আলো ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে যার শিরোনাম করা হয়েছে- "বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার চেতনা এক।"

ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য নিয়ে যমুনা টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে- "অর্থ নয় বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতা চায় ফিলিস্তিনের বিপন্ন মানুষ।"

বাংলাদেশের ৭১ টেলিভিশন, সময় টেলিভিশন, বাংলাভিশন, আরটিভি, এনটিভি, চ্যানেল ২৪, চ্যানেল আই-সহ মূলধারার সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল ফিলিস্তিনি জনগণ এবং প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পক্ষে শুরু থেকেই নিউজ করে চলেছে। সে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। এসব চ্যানেলে বিভিন্ন সময় টকশো এবং লাইভ খবরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেককে যুক্ত করা হয়, নেয়া হয় তাদের মতামত। এর মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে একেবারে ফিলিস্তিন ইস্যুর সাথে যুক্ত করা হয়। দর্শক-শ্রোতারা সেখান থেকে নানামুখী তথ্য এবং বিশ্লেষণ জানতে পারেন।

গণমাধ্যমে ফিলিস্তিন বিষয়ক এই যে সব খবর, তথ্য, ছবি, কার্টুন কিংবা ভিডিও তুলে ধরা হচ্ছে- তা প্রকৃতপক্ষে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মতামতের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষ ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, গাজাবাসীর ওপর যে আগ্রাসন, হত্যাকাণ্ড, বর্বরতা ও নির্যাতন চলছে তার অবসান চাইছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা মানে যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তি মানে যেন এদেশের আপামর জনতার মুক্তি। ৭ অক্টোবর গাজা-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এদেশের বহু মানুষ নানা মাধ্যমে গাজার সাধারণ মানুষের পক্ষে লড়াই করার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার কথা যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি ব্যক্তি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অর্থবিত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন।

জনমতের এই যে প্রবল চাপ তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি এই দেশের গণমাধ্যম। পশ্চিমা কোনো চাপ কিংবা চোখ রাঙানির কাছে নত হয়নি বাংলার গণমাধ্যম, ফিলিস্তিনি জনগণের ব্যথাকে নিজেদের ব্যথা বলে বুকে ধারণ করেছে। ফিলিস্তিনি জনগণের ব্যথায় যেমন ব্যথিত হয়েছে এদেশের মানুষ এবং গণমাধ্যম, তেমনি ফিলিস্তিনিদের সুখের ভাগীদারও হতে চেয়েছে তারা। সে কারণে ইহুদিবাদী ইসরাইলের যেকোন বিপর্যয়ে উল্লসিত হয়েছে এদেশের গণমানুষ, আর তার ছাপ পড়েছে গণমাধ্যমে। তাই তো ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান যখন ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রতিশোধমূলক জবাব দিয়েছে, তখন এ দেশের মানুষের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে গেছে। ইরানকে তারা মাথার মুকুট করতে চেয়েছে।

গাজার হামাসসহ প্রতিরোধ যোদ্ধারা যেমন ফিলিস্তিন সংকটকে বিশ্ব রাজনীতির ডামাডোলে হারিয়ে যেতে দেয়নি, তেমনি ফিলিস্তিন কখনো হারিয়ে যায়নি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে। ফিলিস্তিন জাগরুক আছে বাংলাদেশের জনমানুষের হৃদয়ে, তাদের কল্পনায়, চাওয়া পাওয়ায়; একইভাবে জেগে আছে বই-পুস্তক আর পত্রপত্রিকার পাতায়। কোনো সন্দেহ ছাড়াই বলা যায়- ফিলিস্তিন কখনো হারিয়ে যাবে না এদেশের মানুষের মন থেকে।

লেখক: সাংবাদিক ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষক।

ইসরাইলের ওপর ইরানের ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব হামলার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ

জামালউদ্দিন বারী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা পুঁজিবাদি সাম্রাজ্যের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক নীতির পরিবর্তন অথবা তাদের চূড়ান্ত পতন না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার কোন সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। নাইন-ইলেভেনের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে পশ্চিমা সামরিক এজেন্ডার বাস্তবায়ন চলছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব ও রেজিম চেঞ্জের পর অন্য সবগুলো দেশকে সন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলতে ওয়ার অন টেররের অস্ত্রের পাশাপাশি আইএস'র মতো সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে পশ্চিমাদের ভূমিকা এখন ওপেন-সিক্রেট। এতকিছুর পরও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, জেরুজালেম ও আল আকসা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের অটুট ঐক্য গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। পূর্ব জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রয়াস ও সমর্থনও ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্নে গত ৫ বছরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পর্যায়ে বেশ লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ রাষ্ট্র এরইমধ্যেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাব গ্রহণের আগে ইসরাইলি ও মার্কিনীদের প্রবল কূটনৈতিক চাপের মুখে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণকারী ১৭২টি দেশের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ১১৯ ভোট এবং বিপক্ষে ৮টি ভোট পড়ে যার মধ্যে ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোট ছিল। এছাড়া, ৪৫টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। তবে জাতিসংঘ সনদ, মানবাধিকার সনদ কিংবা ন্যায়বিচার ও গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার ইত্যাদি কোনোকিছুই জায়নবাদী ইসরাইলের উন্মত্ত রক্ত পীপাসায় লাগাম টানতে পারছে না। তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের দোসর হয়ে অস্ত্র ও প্রযুক্তির জোরে বিশ্বমানবতাকে শৃঙ্খলিত করতে চায়। এখানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানই হচ্ছে তার প্রধান বাঁধা। গাজা যুদ্ধে ইরান সমর্থিত হামাস, হিজবুল্লাহ, হুথি, ইসলামী জিহাদ ও ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে মার খেতে থেকে নাস্তানাবুদ ইসরাইল বরাবরই ইরানে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়ে এসেছে। চলতি বছরের ১লা এপ্রিলে দামেস্কের ইরানি কনস্যুলেট ভবনে ইসরাইলি ড্রোন হামলায় ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি ফোর্সের ৫ কমান্ডারসহ অন্তত ১১ জন নিহত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ইরান ঘোষণা দিয়ে ১৪ এপ্রিল 'অপারেশন ট্রু

ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক অভিযান 'ট্রু প্রমিজ'

প্রমিজ' নামে ইসরাইলের অভ্যন্তরের সুনির্দিষ্ট নিশানায় মিসাইল হামলা করে। তিন শতাধিক ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে সীমিত পরিসরের এই হামলায় ইসরাইলের বহুজাতিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক রাতের ড্রোন হামলা প্রতিরোধে ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পেছনে ব্যয় হয় প্রায় দেড় বিলিয়ন বা দেড়শ কোটি ডলার। মধ্যম মানের ড্রোন ও মিসাইল ব্যবহারের পাশাপাশি ইরান মাত্র ৯টি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করেছিল। প্রায় ৯৯ শতাংশ মিসাইল আকাশে ধ্বংসের দাবি করলেও বহুজাতিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাইপারসনিক মিসাইলের একটিও প্রতিরোধ করতে পারেনি।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক অভিযান 'ট্রু প্রমিজ'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া। গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা ও হামাসের প্রতিরোধ শুরুর পর ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অন্তত ৫টি দেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্নে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক ভোটাভুটিতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৪৯৮ জন সদস্য পক্ষে ভোট দেন, এর বিপক্ষে ভোট পড়েছিল ৮৮টি এবং ১১১জন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব অগ্রাহ্য করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে সারাবিশ্বে এই ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা নস্যাৎ করতেই সিরিয়ায় বিদ্রোহ, আইএস'র উত্থান, গাজায় সামরিক আগ্রাসন, লিবিয়া ও ইয়েমেনে বিদ্রোহসহ আরো অনেক কিছুই করা হয়। পক্ষান্তরে রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের শক্ত অবস্থানের মধ্য দিয়ে ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬ বিশ্বশক্তির পারমাণবিক সমঝোতা চুক্তি ইসরাইলের যুদ্ধ পরিকল্পনার উত্তাপে পানি ঢেলে দিয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে তা ভণ্ডুল করে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। ইরানকে কোনঠাসা করে ফিলিস্তিন ইস্যুকে হীমঘরে আবদ্ধ করে ইসরাইলকে আরো শত বছরের জন্য অজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার 'ডিল অফ দ্য সেঞ্চুরি' ব্যর্থ হওয়ার পর ভূ-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইরানের উত্থান পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক নতুন মধ্যপ্রাচ্যের বাস্তবতাকে ক্রমেই সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে অবৈধভাবে জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি ছিল ১৯৪৮ সালের ১৫ মে। দিনটিকে নাকবা বা বিপর্যয়ের দিন হিসেবে স্মরণ করে ফিলিস্তিনি আরবরা। ৭৬তম নাকবা দিবস পালনের একমাস আগে ১৪ এপ্রিল ইসরাইল প্রথমবারের মতো নিজের সামরিক বিপর্যয়ের আলামত দেখতে পেল। সাত দশক পেরিয়ে এসে বিগত দশকের শেষদিক থেকে গাজায় ১৬ বছরব্যাপী ইসরাইলি অবরোধ এবং জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের প্রতিবাদে 'গ্রেট মার্চ টু রিটার্ন' ফিলিস্তিনিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ইসরাইল সীমান্তের কাছে তাঁবু গেঁড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তাদের সেই বিক্ষোভ ও দাবির ন্যায্যতা বিশ্ববাসীর কাছে আবারো প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসরাইলিদের অভিযোগ ছিল, এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক হামাস। তারা ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ঢাল

হিসেবে ব্যবহার করছে। নিজেদের সীমান্তে বিক্ষোভ সমাবেশ ও টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ ঠেকাতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী তাদের স্নাইপার স্কোয়াড মোতায়েন করে। প্রতিদিন শত শত মানুষকে পাখির মতো গুলি করলেও ফিলিস্তিনিরা পিছু হটেনি। দেড়মাসে দেড় শতাধিক মানুষকে হত্যা এবং ১২ হাজারের বেশি নারী, শিশু ও যুবককে আহত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সামনে বর্বরতার আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ইসরাইল। তবে হত্যাকাণ্ডের ভয় দেখিয়ে ফিলিস্তিনিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে গত ৭৫ বছরেও দমিয়ে রাখা যায়নি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের শক্তি ইসরাইলের সামরিক আধিপত্যের গর্বকে ম্লান করে দিয়েছে বার বার। এবারের হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ অতীতের যেকোনো সংঘাতের চেয়ে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে পাথর-গুলতি নিয়ে প্রতিবাদ করতে করতে বেড়ে ওঠা হামাস হিজবুল্লাহর মতো অকুতোভয় মিলিশিয়া বাহিনী অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড শুরুর ৯ মাসের মাথায় যায়নবাদীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এর আগের দেড় দশকে ফিলিস্তিন ও লেবাননের দুই প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে অন্তত দুইবার গ্লানিকর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল জায়নবাদী বাহিনী। শক্তি প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী নীতির কারণে গত ৭৫ বছরেও ইসরাইল তার প্রতিবেশীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর সর্বাত্মক অবরোধ ও বার বার সামরিক হামলা চালিয়েও তাদের প্রতিবাদের শক্তি নিঃশেষ করতে পারেনি। বরং তাদের প্রতিবাদী চেতনা ও আত্মদানের শক্তি ইসরাইলের যায়নবাদী শক্তিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু, হামাস-হিজবুল্লাহর শক্তি ও সক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি এখন ইসরাইলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে উপহাসে পরিণত করেছে। ইসরাইলের নিরাপত্তা ও সামরিক সমৃদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর শত শত কোটি ডলার বরাদ্দ দিলেও উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমা বিশ্ব, আরব প্রতিবেশীরা কিছুই করছে না। ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড বিশ্ব সম্প্রদায় মেনে নিচ্ছে না। ফিলিস্তিনের ভূমি দিবসের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ইসরাইলের স্নাইপার হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনির হতাহতের ঘটনায় সারাবিশ্ব বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তার প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রস্তাবের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের প্রায় সব সদস্যের সমর্থন পাওয়া গেলেও একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে বার বার তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ২০১৮ সালে কুয়েতের আনা প্রস্তাবের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের ১০টি সদস্য রাষ্ট্র ভোট দিয়েছে, ৪টি দেশ ভোটদানে বিরত থেকেছে এবং একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। গাজায় ইসরাইলের নিকৃষ্টতম গণহত্যার মধ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন যখন একচেটিয়াভাবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, তখন নিরাপত্তা পরিষদের এই ভোটাভুটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সভ্যতার সব মানদণ্ডকে লজ্জাবনত করে দেয়। ইসরাইলি স্নাইপারদের গুলিতে শত শত ফিলিস্তিনির মৃত্যু এবং ১২ হাজারের বেশী আহত হওয়ার পর বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রস্তাবকে জাতিসংঘের ইসরাইল-বিরোধী ও পক্ষপাতমূলক অবস্থান বলে গলাবাজি করেছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

মার্কিনীদের অন্ধ ইসরাইল-প্রেম দুই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাধানের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছে। দুই রাষ্ট্রের সমাধান মেনে নিয়ে খোদ ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছিল। গত দশকের শেষদিকে মাহমুদ আব্বাসের দল ইসরাইলের স্বীকৃতি স্থগিত ঘোষণা করেছিল।

জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাধানের সার্বজনীন স্বীকৃত পথ স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দেয়ার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করেছে।

জেরুজালেমের ওপর মুসলমানদের ঐতিহাসিক অধিকারের প্রশ্নটির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অবস্থান এখনো অটুট রয়েছে। তবে মার্কিন প্রশাসন শুধু ফিলিস্তিন সংকটকেই জটিল কওে তোলেনি, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বদলের একমাত্র পন্থা হিসেবে ইসরাইলের নীলনকশা বাস্তবায়নে একটি বড় আকারের যুদ্ধবাদী নীতিও গ্রহণ করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে জো বাইডেন বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তার যেকোনো সম্ভাবনাকে সমূলে ধ্বংস করতে সম্ভাব্য সবকিছুই তারা যৌথভাবে করছে। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, লেবানন, লিবিয়া এবং আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যে জাতিগত সংঘাত, যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতার আগুন জ্বালিয়ে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পুরনো কৌশল ব্যর্থ হয়েছে।

পশ্চিমা প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ইরানের উত্থান এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের দুইশ কোটি মুসলমান এবং বাকি দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষের সমর্থনপুষ্ট ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য আঞ্চলিক বিরোধ ভুলে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ একটি একক ইসরাইল-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তোলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এবারের নাকবা দিবস উপলক্ষে বিশ্ব মুসলমানের মধ্যে এই প্রত্যাশা অনেক বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মার্কিন প্রেসক্রিপশন ছেড়ে নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হলে বিশ্বের সব পরাশক্তি তাদেরকে সমীহ করতে বাধ্য হবে। ইরান বারবার আঞ্চলিক ঐক্য, শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর জোর দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জায়নবাদী ভূত সৌদি আরব, আমিরাত, বাহরাইন, মিশর ও জর্ডানের মতো দেশগুলোর শাসকদের মাথায় এখনো আছর করে আছে। সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেট ভবনে বিমান হামলায় আইআরজিসির ৫ জন কমান্ডারসহ অন্তত ১১ জনের শাহাদাতের পর ইরান দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত 'কৌশলগত ধৈর্যের' নীতি থেকে সরে এসে প্রথমবারের মতো ১৪ এপ্রিল ইসরাইলে নজিরবিহীন ড্রোন ও মিসাইল হামলার মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বের কাছে এক নতুন বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। ইসরাইলের আয়রন ডোম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে একদিনে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার খরচ করেও ইরানের ৯টি হাইপারসনিক মিসাইলের একটিও প্রতিহত করতে না পারা তাদের জন্য বড় ধরণের আতঙ্কের কারণ। ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিমানঘাঁটি 'নাভাতিম এয়ারবেজ' ইরানের হাইপারসনিক মিসাইলে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ইরানের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের আসনকে সুদৃঢ় করেছে। এর জবাবে ১৮ এপ্রিল ইরানের ইসফাহান ও তাবরিজে ইসরাইলের ড্রোন হামলা ছিল খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শহীদ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান বলেছিলেন, ইসরাইলের ড্রোনগুলো শিশুদের খেলনার মতো। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মধ্য আকাশেই এগুলোকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক হামলা

মধ্য এপ্রিলে ইরান-ইসরাইলের পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ চলছিল। ১৯ মে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যকে এক নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন করেছে। ১৪ এপ্রিল ইরানের মিসাইল হামলার জবাবে

ইসফাহান ও তাবরিজে ড্রোন হামলার পর লন্ডনভিত্তিক দৈনিক টেলিগ্রাফের একটি মন্তব্য কলামের শিরোনাম ছিল, 'ইসরাইল হ্যাজ জাস্ট হ্যান্ডেড ইরান অ্যা মেজর ভিক্টরি' যার অর্থ হলো ইসরাইল ইরানের হাতে একটি বড় বিজয় তুলে দিল। দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেট ভবনে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইসরাইলে মিসাইল হামলার পর প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের চিরাচরিত বুলির কথা ভুলে গিয়ে ইসরাইলের পাল্টা হামলার ঘোষণাকে সমর্থন না করা এবং ইসরাইলের সাথে আক্রমণে যোগ না দেয়ার ঘোষণা দিয়ে নিজেদের গা বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। হামাসের দুর্বল রকেট নিক্ষেপের বিপরীতে ইসরাইলের নির্বিচার বিমান হামলা ও পাইকারি হত্যাকাণ্ডকেও যারা এতদিন ধরে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল, ইরানের শত শত ড্রোন, ক্রুজ ও হাইপারসনিক মিসাইলে ইসরাইলি বিমানঘাঁটিসহ সামরিক স্থাপনাগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার পরও তারা খামোশ থাকার বয়ান দিয়েছে! একেই বলে 'ঠেলার নাম বাবাজি'।

ইসফাহানে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের ওপর ইসরাইলের হামলার হুমকির প্রেক্ষাপটে ইরান এই প্রথম তার পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত ঘোষিত নীতি পরিবর্তনের কথাও বলতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ইরানের সংস্কারপন্থী রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিক সাঈদ লায়লাজ তার দেশের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে রাখঢাক না রেখে যথাশীঘ্র পারমাণবিক বোমা বানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি মিডল-ইস্ট আই-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ আহ্বান জানান। একজন ইসরাইলি সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ইরানের হাতে চারটি পারমাণবিক বোমা তৈরির মতো পর্যাপ্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ'র প্রধান রাফায়েল গ্রোসি ডয়েচে ভেলেতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইরান মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পারমাণবিক বোমা বানাতে সক্ষম। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পে ইসরাইলি হামলার আশঙ্কাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেন তিনি। এসব তথ্য প্রকৃত অবস্থাকে নিশ্চিত না করলেও ইরানের কৌশলগত সামরিক সক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বরাজনীতির একটি নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোসহ পুরো পশ্চিমা বিশ্ব শত শত বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েও ইউক্রেনের পরাজয় ঠেকাতে পারছে না। রাশিয়ার সাথে ইরানের সামরিক ঐক্য এই বিজয় নিশ্চিত করেছে। ইরানের সাথে ইসরাইলের সংঘাত পাল্টাপাল্টি হামলায় রূপ নেয়ার পর রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার সাথে চীনের কূটনৈতিক-সামরিক বোঝাপড়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

হামাসের সাথে ইসরাইলের বন্দি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতির আলোচনায় কথিত অগ্রগতির মধ্যেও যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতার আতঙ্কে নিপতিত নেতানিয়াহু আইডিএফকে দিয়ে রাফাহ দখলের অভিযান শুরু করেছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে স্বজন হারানো, বাস্তু হারানো লাখ লাখ ফিলিস্তিনির শেষ আশ্রয় ঘনবসতিপূর্ণ রাফায় গণহত্যা চালানোর মতো নির্মম নির্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু তার পরাজয়ের দিনক্ষণকে আরো প্রলম্বিত করতে চাইছেন। বাহ্যত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি চাইছে। নেতানিয়াহু বন্দি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে হামাস গাজায় যুদ্ধ বন্ধের স্থায়ী সমাধান ছাড়া যুদ্ধবিরতি মেনে না নেয়ার পক্ষে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। যুদ্ধের ২০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেয়া এক বিবৃতিতে হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবায়দা বলেছিলেন, আমরা মাত্র ৬০ মিনিটেই যে ইসরাইলকে পরাজিত করেছিলাম, ২০০ দিন পেরিয়ে এসে তারা বিজয়ের মিথ্যা দাবি করে ইমেজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। আবু ওবায়দার বক্তব্যে ইসরাইলি দখলদার বাহিনী ও নেতানিয়াহু সরকারের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের দিকগুলো উঠে এসেছে। এরপরও তারা রাফায় সবচেয়ে বড় গণহত্যার প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়েছে।

হামাসের সাথে ইসরাইলের বন্দি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতির আলোচনায় কথিত অগ্রগতির মধ্যেও যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতার আতঙ্কে নিপতিত নেতানিয়াহু আইডিএফকে দিয়ে রাফাহ দখলের অভিযান শুরু করেছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে স্বজন হারানো, বাস্তু হারানো লাখ লাখ ফিলিস্তিনির শেষ আশ্রয় ঘনবসতিপূর্ণ রাফায় গণহত্যা চালানোর মতো নির্মম নির্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু তার পরাজয়ের দিনক্ষণকে আরো প্রলম্বিত করতে চাইছেন।

হামাস, হিজবুল্লাহ, হুথি, ইসলামী জিহাদ, ইরাকি রেসিস্ট্যান্স এবং ইরানের আইআরজিসি'র সমন্বিত পদক্ষেপে জায়নবাদী দখলদারিত্বের পতন ঘন্টা বেজে গেছে। আজারবাইজান সীমান্তে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের মৃত্যুর পেছনে ইসরাইলের হাত আছে কিনা সে প্রশ্নের চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, এমন মৃত্যুও ইরানের অগ্রযাত্রাকে এতটুকু স্তিমিত করতে পারছে না। একথা এখন সবাই স্বীকার করছে, ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলেশনারি গার্ড বাহিনী এ অঞ্চলে পাশ্চাত্যের লাঠিয়াল ইসরাইলের আধিপত্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। ইরানের হাত ধরে চীন-রাশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে নতুন ঐক্য, প্রতিরোধ, সমঝোতা ও শান্তির নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৪ এপ্রিল ইসরাইলে ইরানের মিসাইল হামলার ঘটনা তারই সবুজ সংকেত।

মানবাধিকার: বিশ্ব রাজনীতিতে শত্রু ঘায়েলের বড় হাতিয়ার

সিরাজুল ইসলাম

অধিকার হচ্ছে এক ধরনের ক্ষমতা। সমাজ বা রাষ্ট্রের আইন-কানুন এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রথা দ্বারা নির্ধারিত যেসব অধিকার মানুষ বিনা বাধায় চর্চা করতে পারে তাই মূলত মানবাধিকার। যখন কোনো সমাজে এই মানবাধিকার থাকে না তখন মানুষ ক্ষমতাহীন থাকে কিংবা তাকে ক্ষমতাহীন করা হয়। মানবাধিকার এমন একটি বিষয় যার অনুপস্থিতি মানব সমাজকে খুব দ্রুতই একটি 'দানব সমাজে' পরিণত করতে পারে। মানবাধিকারের চর্চা ছাড়া সমাজ একেবারেই অচল। সে কারণে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল চর্চিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে 'মানবাধিকার' ইস্যুটি। সমাজে মানবাধিকারের চর্চা না হলে সে সমাজের মানুষ কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সমাজ চলে যায় ধীরে ধীরে অপশক্তির কবলে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থায় মানবাধিকারের বিষয়টি একটি মৌলিক ইস্যু হয়ে উঠেছে; সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এর অনুপস্থিতি এখন কল্পনা করাও কঠিন। ইতিহাসের পরিক্রমায় এটা বলা এখন মোটেই বাড়তি কিছু হবে না যে, যেদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত সেদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তত গতিশীল।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার ইস্যুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় হিসেবেও গণ্য। ফলে মানবাধিকার ইস্যুকে সহজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, কোনো দেশ বা সমাজকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার জন্য বা স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে মানবাধিকারকে বিরাট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সহজ এবং কার্যকরও বটে। অনেক দেশ আজকাল অভিযোগ করছে- তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার ইস্যুটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনে কারা, কেন এবং কীভাবে মানবাধিকার ইস্যুকে এমন হাতিয়ারে পরিণত করেছে এ নিবন্ধে মোটামুটি তা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবাধিকার কীভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে, কারা সেই লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং কেন মানবাধিকার নিয়ে এই নোংরা রাজনীতি- তার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব। তবে সবার আগে একটু নজর বুলিয়ে নেয়া যাক- আসলে মানবাধিকারকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সে বিষয়ের প্রতি।

মানবাধিকার কী?: মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এর সংজ্ঞা জেনে নেয়া ভালো। মানবাধিকারের সংজ্ঞা হিসেবে উইকিপিডিয়া দ্যা ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া বলছে-

Human rights are moral principles or norms that describe certain standards of human behavior, and are regularly protected as legal rights in municipal and international law.They are commonly understood as inalienable fundamental rights "to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being," and which are "inherent in all human beings" regardless of their nation, location, language, religion, ethnic origin or any other status. They are applicable everywhere and at every time in the sense of being universal, and they are egalitarian in the sense of being the same for everyone.

মানবাধিকার সম্পর্কে দ্যা ফ্রি ডিকশনারি বলছে....

The basic rights and freedoms to which all humans are considered to be titled, often held to include the rights to life, liberty, equality, and a fair trial, freedom from slavery and torture, and freedom of thought and expression.

এসব সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়- মানবাধিকার হচ্ছে প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একইসাথে সহজাত ও আইনগত। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হলো এসব

অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

কী আছে জাতিসংঘ সার্বজনীন ঘোষণায়: মানবাধিকারের ধারণাটি আঠারো শতকে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশকালের ফসল। তবে সমসাময়িক মানবাধিকারের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। মৌলিক অধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটে মূলত 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' বা ইউডিএইচআর-এর মাধ্যমে যা ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতা থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক একটি সনদ হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ অক্টোবরের ওই ঘোষণায় ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে বেসামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে যেগুলো সব মানুষ উপভোগ করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- এ ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করতে চীন, লেবানন ও চিলিসহ পশ্চিমা বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমা বিশ্বে মানবাধিকার: এ কথা সত্যি যে, পশ্চিমা দেশগুলো অভ্যন্তরীণভাবে জনগণের অধিকার বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। সে কারণে মানবাধিকার নিয়ে তাদের কণ্ঠ বেশ উচ্চকিত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পশ্চিমা বিশ্বে এখনো ধনী-গরিবের বৈষম্য রয়েছে, বর্ণবাদের মতো জঘন্য অসুখ এখানো মারাত্মকভাবে বাসা বেধে আছে। কোনো কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হলেও আমেরিকার মতো দেশে এখনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং সেসব মৃত্যুদণ্ড নিয়ে বিতর্কও ওঠে। ভুল বিচারের শিকার হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের ৩৪ বছর জেল খাটার নজিরও রয়েছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে ও কানাডাসহ বহু দেশে মুসলমান হওয়ার দায়ে বহু মানুষকে নিগৃহীত হতে হয়। সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর জন্য মাঝে মাঝেই ইউরোপ বা আমেরিকায় মুসলমানদের নবী (স) কে নিয়ে বিতর্কিত কার্টুন ছাপা হয়। কখনো কখনো কুরআন পোড়ানোর মতো জঘন্য সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হয়। নরওয়েতে মুসলিম বিস্তার রোধ করতে ব্রেইভিকের মতো উগ্রবাদীরা ডানপন্থার নামে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষ গুলি করে মারে! আবার বিচারের কাঠগড়ায় তুলে মানসিক বিকারগ্রস্ত সার্টিফিকেট দিয়ে তার শাস্তি মওকুফ করা হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ, অবরোধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবাধিকার লঙ্ঘনে পশ্চিমাদের রয়েছে ভিন্ন চেহারা; ভিন্ন রেকর্ড। বহুদিন ধরে বিশ্ব ক্ষমতার দণ্ড পশ্চিমাদের হাতে। সেকারণে তারা সে ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে অবলীলায়। যে দেশ পছন্দের নয়; যে দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা কিংবা সামরিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেইসব দেশের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে পশ্চিমারা। এমন অভিযোগ এনে শত্রুদেশকে ঘায়েলের কাজে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর মিত্রদেশগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ কাজে ওয়াশিংটনের যোগ্য সঙ্গী! মার্কিন বলয়ের বাইরের দেশগুলোতে মানবাধিকার যত উন্নতই থাকুক না কেন, তাদেরকে প্রতিবছর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে চলেছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা গোষ্ঠী। এমন অন্যায় অভিযোগের মূল শিকার ইরান, সিরিয়া, রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভেনিজুয়েলাসহ তার শত্রুদেশগুলো। লক্ষ্য করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে- এসব দেশ কেউই মার্কিন প্রভাব বলয়ের ভেতরে থাকতে চায় না বরং সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দেয়। মার্কিন সরকারগুলো মুখে যত কথাই বলুক, গণতন্ত্রের যত বুলি আওড়াক এবং মানবাধিকারের জন্য তাদের হৃদয়ের যত

ইরাকি কারাগারে মার্কিন সেনাদের নির্যাতন

ছটফটানি দেখাক না কেন- উপরোক্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে একদম জোর জবরদস্তিমূলক অভিযোগ করে আসছে শুধুমাত্র ওয়াশিংটনের কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার কারণে। এছাড়া, কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও আমেরিকার অন্যতম বড় লক্ষ্য। বিশ্বের যেসব দেশ মার্কিন কর্তৃত্ব মানতে নারাজ এবং প্রতিবাদী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত নানা গোয়েন্দাবৃত্তি, অভ্যন্তরীণ নাশকতা, এসব দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন সময় খুন কিংবা অপহরণ পর্যন্ত করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ নেতানেত্রী, মন্ত্রী, কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কারো কারো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়। পণ্য আমদানি-রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত করেছে। মার্কিন অবরোধের শিকার হয়ে শিশুখাদ্যের অভাবে বিশ্বের কত শিশু পুষ্টিহীন হয়ে বেড়ে ওঠে; কারো অকাল মৃত্যু হয়- তার ঠিক নেই। ভিত্তিহীন অভিযোগে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আটক করে আর চূড়ান্তভাবে শত্রুদেশটিকে বাগে আনা না গেলে হয় অবরোধ চাপিয়ে দেয়, না হয় যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ ও অবরোধের প্রশ্নে ব্রিটেন, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পশ্চিমাঘেঁষা অস্ট্রেলিয়া,

নিউজিল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া সবাই এগিয়ে যায় মার্কিন সমর্থনে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যুদ্ধের সময়। বাস্তবতা হচ্ছে- মার্কিন নেতৃত্বে যত যুদ্ধ হয়েছে তার সবই অসম যুদ্ধ ছিল। অথচ তাতে সমর্থন দিতে মোটেই দ্বিধা করে না মানবাধিকারের ঢোল পেটানো এসব দেশ। ন্যাটোর মতো সামরিক জোট গঠন করে তার আন্তর্জাতিক একটি রূপ দিয়ে দলগতভাবে সাম্প্রতিককালে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া এবং বর্তমানে সিরিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ইরান, রাশিয়া, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের ওপর বছরের পর বছর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাখে। বিভিন্ন দেশে অর্থ আটক করা হয় কিংবা অন্যসব মিত্রদেশকে এক রকম জোর করে, প্রভাব খাটিয়ে এসব শত্রুদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে বাধ্য করা হয়। তাতে বিশ্বে কত শিশুর করুণ মৃত্যু হয় কে তার খবর রাখে! কত মানুষ জরুরি ওষুধের অভাবে ভুগতে থাকে মৃত্যুশয্যায় অথবা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় সে সংখ্যা বা কে জানে! বিশ্বের কত জনপদে খেলতে খেলতে মার্কিন সেনারা শিশুকে গুলি করে মারে, কত ড্রোন হামলা চালায়, কত মানুষকে অপহরণ করে গুয়ান্তানামোর মতো কুখ্যাত কারগারে রাখে ক'জনই বা তার খবর রাখে! শুধু মার্কিন মুল্লুকে নয়, ইউরোপে আমেরিকার মিত্রদেশগুলোতে কত গোপন জিন্দানখানা তৈরি করা হয় সে খবর কে প্রকাশ করবে? মানবাধিকারের কথা যাদের মুখে রাতদিন খইয়ের মতো ফুটতে থাকে সেই আমেরিকার কারাগারে মানুষ বিনাবিচারে আটক থাকে বছরের পর বছর শুধুমাত্র কথিত 'মুসলিম সন্ত্রাসী' হওয়ার কারণে। সন্ত্রাসবাদের নাম করে কত দেশ বিরানভূমিতে পরিণত করেছে আমেরিকা তা তো চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। গুটিকতক মানুষের কথিত অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে পুরো জাতিকে নাস্তানাবুদ করে দেয়ার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকার হাতেই। বিশ্বে প্রকাশ্যে পরমাণু বোমা ব্যবহারের কালিমাও আমেরিকার কপালে। সঙ্গত কারণেই বলতে হয়- কী অদ্ভুত এদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ধরণ! আড়ালে থাকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক খায়েশ।

মার্কিন সেনাদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার গুয়ান্তানামো কারাগারের বন্দীরা

সামরিক অভ্যুত্থান ও মানবাধিকার: এমন অভিযোগও রয়েছে- বিশ্বের প্রায় কোনো দেশেই মার্কিন মদদ ছাড়া সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি। অভ্যুত্থানের পর বড় জোর কিছুদিন লোক-দেখানো সম্পর্ক ছিন্ন রাখে; পরে আবার ঠিকই সব সহযোগিতা শুরু হয়। এই তো মিশরে তার একটি নজির আমরা দেখতে পেয়েছি। সামরিক অভ্যুত্থান এবং তার পরবর্তীতে যেসব প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। সামরিক অভ্যুত্থান করিয়ে 'বেয়াড়া' নেতাদেরকে জেল-জুলুমের মুখে ফেলা হয়। অনেককে ফাঁসি দেয়া হয়। কারো দেহে মারাত্মক রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়া হয়। অবাধ্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর কখনো নানা রকমের ওষুধের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যন্ত চালানো হয়। এমন ঘটনা ঘটেছে গুয়েতেমালায়। মার্কিন গবেষকরা কথিত গবেষণার নামে গুয়েতেমালার কারাবন্দিদের মাঝে গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগের সংক্রমণ ঘটিয়েছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত গুয়েতেমালায় এ গবেষণা চালানো হয়েছিলো এবং এর মাধ্যমে দেশটির দেড় হাজার কারাবন্দি ও মানসিক হাসপাতালের রোগীদের দেহে তাদের অগোচরে ভয়াবহ যৌন রোগ গণোরিয়া ও সিফিলিসের সংক্রমণ ঘটানো হয়। সে সময় নতুন আবিষ্কৃত ওষুধ পেনিসিলিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য গুয়েতেমালায় এই অমানবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনা তদন্তের জন্য সম্প্রতি গুয়েতেমালা কমিটি পর্যন্ত করেছে। এগুলো পরিষ্কার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং এসবের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র ঠিক রাখার চেষ্টা করে, তবে অন্য দেশে তা অহরহ লঙ্ঘন করে। বিশ্বেও বহু দেশকে বাগে আনতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মানবাধিকারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।#

লেখক- সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্ক দৃঢ়করণে ফারসি শিক্ষার ভূমিকা

তানজিনা বিনতে নূর

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দুটি প্রভাবশালী দেশ হচ্ছে ইরান ও বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বিশ্ব রাজনীতিতে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রয়েছে দু'টি দেশেরই। শত শত মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এই দুটি দেশের সম্পর্কের শেকড় অভিন্ন ইসলামী ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। প্রাচীনকাল থেকেই ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো, যা এখনো বিদ্যমান আছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে। ফারসি এমন একটি ভাষা যার সাথে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এই ভাষা সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক। একই সাথে পশ্চিম এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত কথ্য ভাষা হিসেবে আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক উন্নয়নের চাবিকাঠিও বলা চলে এই ভাষাকে; কেননা পৃথিবীর তিনটি দেশের (ইরান, আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তান) প্রধান ভাষা হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের মোট ১৫০ মিলিয়ন মানুষের মুখের ভাষা এটি। শুধু তাই নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারক ও বাহক ফারসি ভাষা ও এর সাহিত্য।

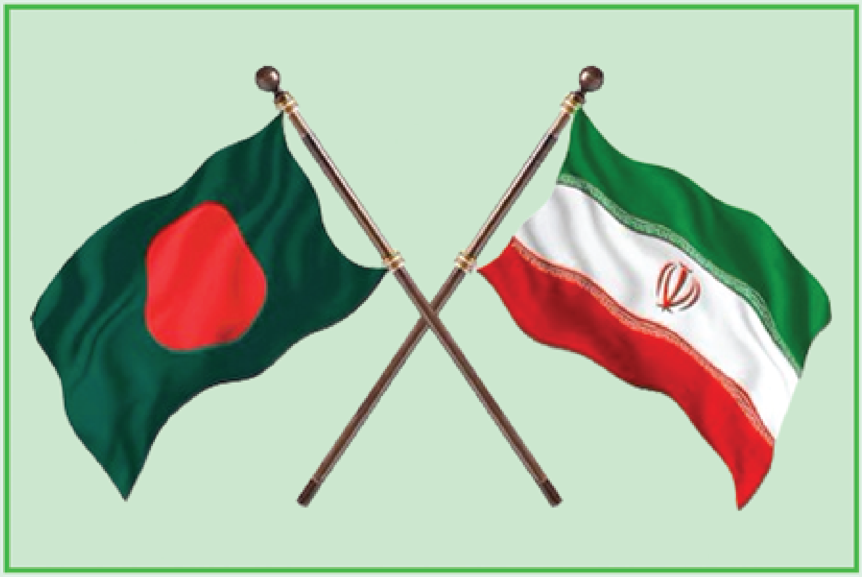

ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই পারস্য সভ্যতা ও ফারসি ভাষার সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং উভয় সভ্যতা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে ফারসি ভাষার ইতিহাস। বাংলাদেশে ফারসি ভাষার আগমনের ইতিহাস ৭০০ বছরের পুরনো। প্রথমে তা খলিফা হারুনর রশিদের আমলে ইরানি মুসলিম বণিক, সেমেটিক আরব ও পবিত্র ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে ফারসিভাষী মুসলিম বিজেতাদের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে এই অঞ্চলে ফারসিভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুসলিম শাসনামলে ইরান এবং মধ্য এশিয়া হতে কবি ও আলেমগণ এ ভূখণ্ডে আগমন করেন এবং তারা ফারসি ভাষার বিকাশ ও বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখেন। আমাদের দেশে ইসলাম এসেছে ইরান থেকে বা ইরান হয়ে। আধ্যাত্মবাদ, ফারসি ভাষায় যাকে আমরা এরফান বা তাসাউফ নামে চিনি, এই বাংলা ভূখণ্ডে এর প্রবেশ ঘটেছে ফারসিভাষী সুফি-দরবেশ ও আউলিয়াদের হাত ধরেই। সুফিবাদের উৎপত্তি পারস্যে হলেও, এর বিকাশ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ভারতীয় উপমহাদেশে, আজকের বাংলাদেশ যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পারস্য থেকে আগত ইসলাম প্রচারকরা এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং এই ভূখণ্ডের জনগণের সাথে ফারসিভাষী সুফি দরবেশ ও ফারসি-জানা ব্যবসায়ী ও ইসলাম প্রচারকদের আন্তঃক্রিয়ার ফলে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা।

বাংলা কথ্য ভাষায় প্রচুর আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি এদেশের মানুষের নামে, পারিবারিক ও পেশাগত উপাধিতে, স্থানের নামে, প্রতিষ্ঠানের নামে, সামাজিক বিষয়াদিতে, আইন-আদালতে এমনকি খাবার ও পোশাকের নামেও প্রচুর ফারসি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশি প্রচুর সাংস্কৃতিক উৎসব পারস্য প্রভাবজাত; যেমন- হালখাতা, পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষের অনুষ্ঠান, মহররম ইত্যাদি। এ থেকে প্রমাণ হয় ফারসি ভাষা এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এতদঞ্চলে একই গতিতে ব্যাপকভাবে ফারসি চর্চা অব্যাহত ছিলো। এমনকি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেও বাংলা অঞ্চলে ফারসি ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা যায়। তবে ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ফারসি শেখার তেমন উপযোগিতা না থাকায়, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফারসি অনুমোদিত ভাষা হিসেবে অস্তিত্বশীল থাকলেও এর চর্চা বহুলাংশে কমে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের শুরুর দিকে বাংলাদেশে ফারসির চর্চা অনেকটাই ব্যক্তিপর্যায়ে এবং বুদ্ধিজীবী ও সুধী মহলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেটির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফারসি চর্চার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার প্রথমেই আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।

শতবর্ষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই ফারসি বিভাগ এর পথচলার সঙ্গী হয়ে আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সালে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে ফারসি বিভাগের পথচলা শুরু হয়েছিল যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ফারসি ভাষার মাতৃক্রোড় হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রেমিকদের আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়াকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিও ব্যতিক্রম নয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকলেও ১৯৭৭ সালে ইরান-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে তা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। এই চুক্তির ফলে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি বাংলাদেশে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলা ভাষার শিকড় অন্বেষণে, বাংলা সাহিত্যের পথ-পরিক্রমা ও বিবর্তনে, বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে, সর্বোপরি ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ আর ইরানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক বর্তমানে এতটাই নিবিড় যে, ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ফারসি ভাষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশী ফারসি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আগের যেকোন সময়ের তুলনায় এখন বেশি। তাদের অনেকেই সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন, পরিবার গঠন করছেন। বাংলাদেশেও কর্মসূত্রে আসছেন বিপুল সংখ্যক ইরানি নাগরিক, যাদের মধ্যে সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা থেকে শুরু করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক সকলেই রয়েছেন। এর ফলে পারস্পারিক ভাষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটছে, বাংলা-ইরান পুরনো সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। প্রতি বছরই ঢাকায় এবং ইরানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নানান উৎসব, যেমন- চারুকলা উৎসব, চলচ্চিত্র উৎসব, বাণিজ্য মেলাসহ আরো অনেক আয়োজন। আর এসব আয়োজনে উভয় দেশ থেকেই শিল্পী, কলা-কুশলীরা অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন খেলাধুলার সংগঠনে কোচ হিসেবে আসছেন ইরানের স্বনামধন্য কোচরা। এসব চলচ্চিত্রকার, শিল্পী, খেলোয়াড়, কোচ, ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রীয় আমলা- প্রত্যেকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি আর এসব কাজে প্রয়োজন পড়ছে ফারসি ভাষায় যোগাযোগে দক্ষ ব্যক্তিদের।

বাংলাদেশের সাথে ইরানের এই দীর্ঘদিনের সুপ্রাচীন সম্পর্কের বিষয়টি এতটাই বিস্তৃত যে, তা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বরাবরই এই সুসম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও ইরান-বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদারে এই ভাষার চর্চার গুরুত্বের দিকটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন এবং ফিল্ম মিডিয়া। আর ইরানের চলচ্চিত্র দুনিয়ার অনন্য -তা আজ সর্বজনবিদিত। ইরানের চলচ্চিত্র শুধু ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এর প্রশংসা ও পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। বাংলাদেশের একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে ফারসি থেকে অনূদিত দারুণ সব দর্শকপ্রিয় সিরিয়াল দেখা যাচ্ছে। খুব সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ইরানের মধ্যে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণেও ব্যপক সাড়া পাওয়া গেছে। ইরানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী যেমন বাংলাদেশে আসছেন, একইভাবে বাংলাদেশের বরেণ্য চলচ্চিত্র কলাকুশলীরাও ইরানের বিভিন্ন সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। সুতরাং, বিশ্ব মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণে ইরান-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত চলচ্চিত্র হতে পারে একটি দারুণ সম্ভাবনাময় দিক।

ইরান ও বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতিম দুটি দেশ। উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, তা বর্তমানেও বজায় আছে। প্রতি বছরই দুই দেশের মধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সফর বিনিময় হচ্ছে। ইরান-বাংলাদেশ মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শক্ত ভিত রচিত হয়েছে। পুরো পৃথিবীকে আজ 'বিশ্বগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর এই বিশ্বগ্রামে যেসকল দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি জোরদার, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির দিক থেকে তারাই বেশি এগিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ-ইরানের মধ্যে যে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তার যথাযথ বিকাশ সাধনে ফারসি ভাষা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। এর মধ্য দিয়েই দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো হৃদ্যতাপূর্ণ ও ইতিবাচক হয়ে উঠবে।

লেখক: প্রভাষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাদি শিরাজীর অমরত্বের রহস্য

ড. মাজিদ পুইয়ান

চোখ থাকলেও দেখার নজর মানুষভেদে ভিন
ভালোবাসা এক জিনিস আর স্বার্থপরতা অন্য

সাদি শিরাজী ইরান ও বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তার জীবদ্দশার পর সাত শতক পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনও তার রচনাগুলো বিশ্বজুড়ে পঠিত হয়, অনূদিত হয়। সারা বিশ্বের গবেষণামূলক ও একাডেমিক পড়াশোনায় তার রচনাগুলো ব্যবহৃত হয়; সেগুলো সম্পর্কে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন জাগে, সত্যিকার অর্থে সাদি শিরাজীর এমন অমরত্বের রহস্য কী?

ভালোভাবে জানেন; ক্রোধ, লোভ-লালসা, ক্ষমতার প্রলোভন ও অহংকার থেকে শুরু করে আনুগত্য, ইবাদত ও আনন্দের মাধুর্য পর্যন্ত। তিনি মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জীবনের কবি; আর তার মনোভাবের এই ভারসাম্যই সারা বিশ্বে তার সৃষ্টির এমন অমরত্ব লাভের গোপন রহস্য।

সাদি একজন সম্পূর্ণ লেখক, সাহিত্যের সকল শাখায় তার সদর্প বিচরণ

প্রকৃতই, গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে বাগ্মীতার শক্তি ও সামর্থ্য বিবেচনায় আর কোন কবি বা লেখককে সাদির সমকক্ষ বলা যেতে

অমর কবি শেখ সাদীর মাজার

শেখ সাদি, একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী

তার ব্যক্তিত্বের এই বহুমাত্রিকতা তার চরিত্রকে একটি বিশেষ প্রশস্ততা দেয়। তিনি একদিকে যেমন সাধনার মধ্য দিয়ে ইহজগতকে তুচ্ছজ্ঞান করার আহ্বান জানান, অন্যদিকে তেমনি এই বিশ্ব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন ও প্রেম ভালোবাসার সদ্ব্যবহারেরও আমন্ত্রণ জানান। তিনি যেমন নৈতিকতা, আধ্যাত্মবাদ এবং হেকমত বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে কথা বলেন, তেমনি রাজনীতি, সুবিধাবাদিতা এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি ইবাদত, জিহাদ ও তাহাজ্জুদ সম্পর্কে কথা বলেন, আবার প্রেম, জোশ ও মত্ততা নিয়েও আলোচনা করেন। তার এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে তার পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি আত্মা ও তার অবক্ষয়ের কারণগুলো সম্পর্কে

পারে? সাদি যখন ক্বাসিদা লিখেছেন, তখন তিনি ক্বাসিদা রচনার মূলনীতির বাইরে গিয়ে, নেহায়েতই স্রষ্টার প্রশংসামূলক গীতি-কাব্যের ধাঁচ থেকে বের করে এনে, সেটিকে উপদেশ এমনকি প্রশংসার সমালোচনার একটি মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যখন তিনি গজল রচনা করেছেন, সেগুলো সাহিত্যের জগতে পুনরুত্থান এনেছে। যখন তিনি নীতিকথামূলক মসনভী রচনা করেছেন, পুরো বিশ্ব তার সেই মসনভীর 'বুস্তানে' বা সৌরভে সুরভিত হয়েছে। হাস্যরস ও রসিকতাপূর্ণ বিদ্রুপাত্মক লেখায় তিনি তার অগ্রজদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন। সাদির রচনাগুলো এমনই অনন্য।

তার সহজাত প্রতিভা দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের উপদেশ বা পরামর্শ শোনার মতো ধৈর্য্য নেই। আর সেজন্যই তিনি

তিক্ত উপদেশের ঔষধকে লালিত্যের মধুভাণ্ডারের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে নিস্তেজ মানুষ এর প্রাকৃতিক স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত না হয়।

স্রষ্টাপ্রদত্ত শৈল্পিক বাগ্মীতার দক্ষতাকে সাদি শুধু প্রেম, প্রজ্ঞা বা নীতিবোধ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেননি; তিনি তার গুলিস্তান ও বুস্তানের গল্পে, পরোক্ষভাবে ও প্রবল বুদ্ধিমত্তার সাথে, রাজা-বাদশা ও ক্ষমতার অধিপতিদেরকে জুলুম ও নিপীড়নের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। ছোট ও মধুর প্রবাদ, বাক্য এবং উপাখ্যান ব্যবহার সাদির রচনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা তার ভাষাকে আকর্ষণীয় ও দীর্ঘস্থায়ী করেছে। যেমন এই কবিতাটি-

বন্ধু যখন তার ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয়
আমি তার পদতলে কোরবান হয়ে যাই
সে যদি তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সাথে থাকে

অমর কবি শেখ সাদীর মাজারের সম্মুখভাগ

অপ্রীতিকর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং এসব থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন। যেমন তিনি গুলিস্তানে বলেছেন- 'রাখাল যেমন নেকড়ের হাত থেকে তার পশুপালকে রক্ষা করে, একজন বাদশাও তেমনি তার প্রজাদের রক্ষা করেন। এর বিপরীতে, যে বাদশাহ তার প্রজাদের ওপর জুলুম ও নির্যাতন করেন, তিনি আসলে এর মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনেন।'

সাদির একটি সরল ও মানসিক ভাষাগত প্রকৃতি রয়েছে

সাদি সেসব ইরানি কবি ও লেখকদের মধ্যে অন্যতম যাদের কথা ও রচনা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। তার রচনাগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পঠিত হয়েছে, কারণ তার ভাষা সহজ, সাবলীল এবং প্রাকৃতিক ভাষার কাছাকাছি; এটি জটিল নয় এবং এটি বুঝতে অনেক বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আর তাই ফারসিভাষী ও ফারসি চর্চাকারী বিদ্বান ব্যক্তিরা ন্যূনতম প্রচেষ্টাতেই তার রচনাগুলো পড়তে ও বুঝতে পারেন এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হন। সমাজের সকল স্তরের জন্য বোধগম্য একটি ভাষা ব্যবহার করে, তিনি সহজে ও স্পষ্টভাবে তার পাঠকদের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি সাদির রচনাগুলোকে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বোধগম্য ও

তবে আমিও মাটির সাথে মিশে যাওয়া অবধি তার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখি
সে আমাকে ভালোবেসে যা-ই করতে বলে
আমি সেটাকে তার হুকুম মেনে পালন করি
আমার ঘর যদি আঁধারে পূর্ণ থাকে
তবুও আমার বন্ধুকে দেখার পর আমার হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়

সাদির রচনায় নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়।

এটি তার রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাদি তার লেখাগুলোতে ন্যায়বিচার, প্রেম, বন্ধুত্ব, ন্যায্যতা এবং ক্ষমার মতো বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন এবং তথ্যপূর্ণ গল্প ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে তার পাঠকদেরকে আরও উত্তম ও মানবিক জীবনের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তার গুলিস্তান গ্রন্থের কথা, যেখানে তিনি তার পাঠকদেরকে ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষাপূর্ণ গল্প ব্যবহার করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখিয়েছেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য। এই নৈতিক ও মানবিক শিক্ষাগুলো সাদির রচনাকে সদা অধ্যয়নযোগ্য এবং তার বার্তাগুলোকে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। যেমন, গুলিস্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

অধ্যায়ের একটি গল্পে তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাগ্মীতাপূর্ণ ভাষায়, একজন পন্ডিত ব্যক্তির মুখ দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন: 'একবার এক ভারতীয় মুখ দিয়ে আগুনের গোলা বের করার কৌশল শিখছিল। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিলেন- 'তোমার ঘর যেহেতু শন ও বাঁশের তৈরি, তাই এই খেলাটি তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।'

সাদি একজন বিশ্বদ্রষ্টা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনীষী

সাদি শিরাজী তার জীবনের অনেকগুলো বছর ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো তাকে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও রীতিনীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং তিনি মানবিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। তার এই বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ তার রচনায় খুব ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাকে জীবন ও মানুষকে আরও গভীর ও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম করেছে। সেইসাথে এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাদির রচনাগুলো ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে সারা বিশ্বের নজরে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, গুলিস্তান গ্রন্থের এই গল্পটিতে দেখুন কিভাবে সাদি

ভরপেট মানুষের কাছে মুরগীর বিরিয়ানি
গাছের পাতার মতই বিস্বাদ ও অপ্রয়োজনীয়
কিন্তু যে ক্ষুধার্তের তা বানিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য নেই
তার কাছে শালগমের স্বাদই মুরগীর বিরিয়ানির মত।

সাদি একজন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী গল্পকার

গল্প বা উপাখ্যানের রসালো বর্ণনা সব যুগে পৃথিবীর সব মানুষের একটি সহজাত ধারা। সাদির রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার গল্প বলার ক্ষমতা। সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় ঘটনা ব্যবহার করে সাদি তার পাঠকদেরকে গভীর ও শিক্ষামূলক বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনাগুলো- যা সাধারণ, সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত- সহজেই পাঠকদের মনে দাগ কাটে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। শৈল্পিকভাবে গল্প বলার এই সহজাত ক্ষমতাই সাদিকে বিশ্বের সুমহান সাহিত্যিকদের কাতারে নিয়ে এসেছে। তার গল্পগুলো সুন্দর ও প্রাণবন্ত, একইসাথে মাধুর্য, সৌন্দর্য ও প্রভাবশালীতার এক অপূর্ব সংকলন। নিচের এই গল্পটিতে দেখুন, সাদি ক্ষমতা ও রাজত্ব সম্পর্কে রাজাদের মোহ ও আকাঙ্খার কথা কত সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন-

খোরাসানের জনৈক বাদশা মাহমুদ সাবুকতাগিন স্বপ্নে দেখেছিলেন

মানুষকে তার সুস্বাস্থ্যের নেয়ামতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যাতে সে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে-

আমি কখনোই সময়ের অতিক্রান্ততা সম্পর্কে অভিযোগ করিনি বা আকাশে ভ্রমণ নিয়েও কখনো আফসোস করিনি। শুধু একবার আমার পা জোড়া খালি ছিল এবং পায়ে পরার মত কিছু ছিল না বলে আমার দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি কুফার এক মসজিদে গেলাম এবং সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম যার পা-ই ছিল না। তখনই আমি আমার প্রতি স্রষ্টার নেয়ামতের আশীর্বাদ অনুভব করতে পারলাম এবং জুতা ছাড়াই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

যে, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ধুলোর সাথে মিশে গেলেও তার চোখ দুটো তখনও কোটরের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে এবং চারদিকে নজর বুলাচ্ছে। সকল মনীষী তার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন শুধু একজন দরবেশ ছাড়া, যিনি বলেছিলেন: 'এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরও তোমার সাম্রাজ্য নিয়ে তোমার চিন্তা যাবে না যে, এখন সেটি অন্যদের হাতে কীভাবে রয়েছে।'

মানুষ যখন তোমায় দাফন করবে, তখন মাটির ওপর তোমার কোন চিহ্নও থাকবে না

আর মাটি তোমায় এমনভাবে গ্রাস করবে যে তোমার এক টুকরো হাড়ও বাকি রাখবে না

তাই যতক্ষণ বেঁচে আছ ভালো কাজের আনন্দ নিয়ে বাঁচো
যাতে তুমি না থাকলেও তোমার কর্ম তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে
ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে ভালো কাজে কাটাও হে
মসজিদের মিনার থেকে তোমার মৃত্যুর ঘোষণা আসার আগে।

যার প্রতি বাদশার অন্যায় রোষ
ঝরিয়ে রক্ত তাকে করেছিল শেষ

হাজী সাহেব বাদশাকে কুর্নিশ না করায়
বিচার বসলো বাদশা হেজাজের রাজসভায়
খোদাভীরু লোকটি প্রথম হাসল, তারপর কাঁদল
এটা দেখে সভার সবাই বেজায় অবাক হলো

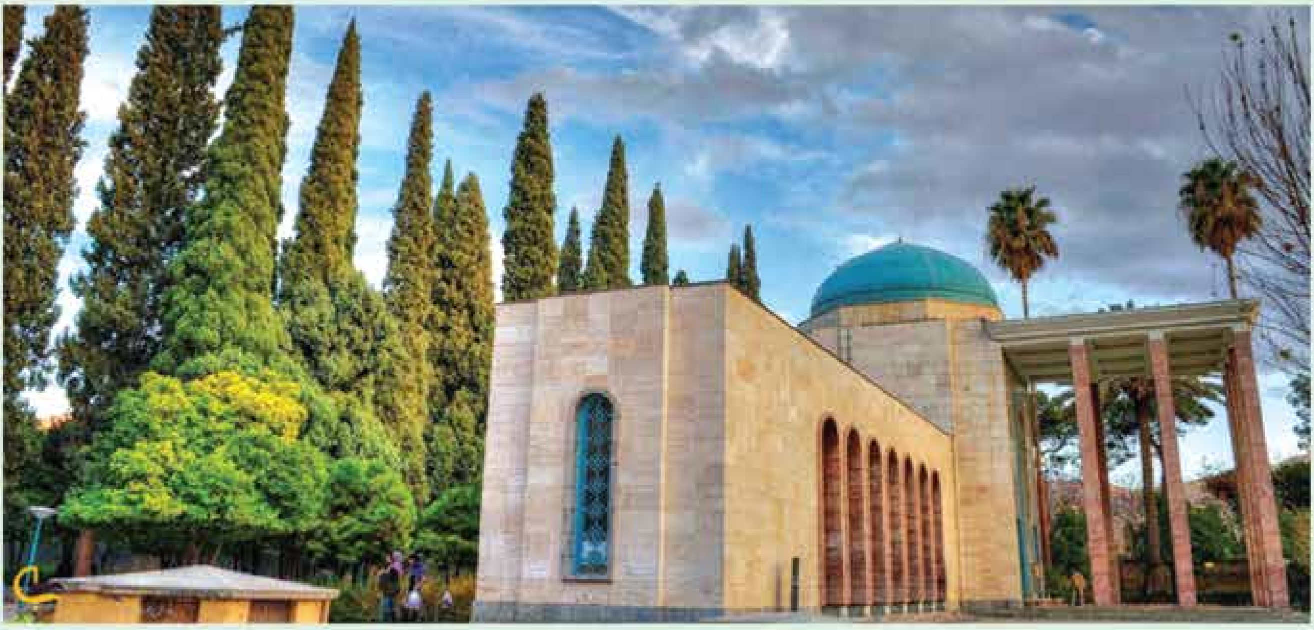

অমর কবি শেখ সাদীর মাজারের অপরূপ দৃশ্য

মানুষ ও মানবতার প্রতি সাদির রয়েছে অগাধ ভালোবাসা।

খুব কম কবি সাহিত্যিকই সাদির মতো প্রতিনিয়ত ন্যায্যতা, ক্ষমা ও ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। বাদশাদের উদ্দেশ্যে লেখা তার গুলিস্তান ও বুস্তান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়- যেখানে তিনি রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার, পরিকল্পনা ও ভোটদানের বিষয়ে কথা বলেছেন- সেটি তাদের অত্যাচার ও ক্ষমতার দম্ভের বিপক্ষে তার পরামর্শ ও তার মৌলিক উদ্বেগকে প্রকাশ করে। কেননা সাদি প্রকৃতই একজন মানবপ্রেমী ও মানবতাবাদী মানুষ।

আমি মাটির পৃথিবীকেই ভালোবাসি কেননা এই মাটির পৃথিবী আমার স্রষ্টার সৃষ্টি
সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসি কেননা এই পুরো বিশ্ব জাহান তাঁর সৃষ্টি।

চিত্রকল্প ও বর্ণনার দক্ষতায় সাদি অনন্য

সাদির রচনার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো তার চিত্রকল্প ও ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনার ক্ষমতা। বিবরণে পূর্ণ দৃশ্যকল্পমূলক ভাষা ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন দৃশ্য ও মেজাজকে এমনভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম যে, তার পাঠকরা সহজেই সেটি কল্পনা করে নিতে পারেন। চিত্রকল্প রচনা ও সেটির সুচারু বর্ণনার এই দক্ষতা সাদির রচনার বিশেষ এবং অবিস্মরণীয় আকর্ষণ। যেমন- 'বুস্তানে' সাদির প্রকৃতি ও মানুষের বর্ণনাসমূহ তার প্রাণবন্ত ও বাস্তব চিত্রকল্প তৈরির ক্ষমতার শক্তিশালী উদাহরণ। তিনি বলেছেন-

এক নেকদিল মানুষের গল্প শোনো এই
হাজ্জাজ বিন ইউসুফেরও এমন খ্যাতি নেই

তার এই হাসি কান্নার অর্থ জানতে চাইল
'এর মানে কি?' সবাই তাকে এটাই প্রশ্ন করল
'কিছু শিশু সন্তান আছে আমার'- বললেন তিনি জবাবে
'তাদের কথা ভেবেই আমি কেঁদে উঠেছি এভাবে।'
'পরক্ষণেই হাসি এল খোদার রহমতে
জালিম নয়, দুনিয়া থেকে যাব মজলুম রূপে...'

গদ্য ও পদ্যে, নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষায়, সরল ও সাবলীল ভাষা ব্যবহারে, বিশ্বদৃষ্টি ও বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনায়, গল্প বলার শিল্পে ও দক্ষতায়, অভিব্যক্তি ও চিত্রকল্পের উদ্ভাবনী শক্তির মিশেলে- শেখ সাদি শিরাজী হলেন ইরান তথা বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। তার জনহিতৈষী, দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয় চিন্তাধারা শুধু ফারসি সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অনুপম স্থান খুঁজে পেয়েছে। এগুলোই তার রচনার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও অমরত্বের রহস্য যা এখনও মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে।

লেখক: ভিজিটিং প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'মানতেকুত তাইর'

আবদুস সবুর খান

ফারসি সুফি-সাহিত্যের হিমাদ্রিসদৃশ কবি ও সুফি সাধক হজরত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাহিত্যপ্রতিভা এতটাই উজ্জ্বল যে, অদ্যাবধি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম বিশ্বের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসু পাঠক-পথিকদের পথে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থটি দীর্ঘকাল থেকে বহুল পঠিত, সমাদৃত এবং প্রশংসিত হয়ে আসছে। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ আর্থার জন আরবেরি এটি মূল ফারসি থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে ইংরেজিতে 'মুসলিম সেইন্টস অ্যান্ড মিসটিকস: আ ট্রান্সলেশন অব এপিসোডস ফ্রম তাজকিরাতুল আউলিয়া' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। আত্তারের শ্রেষ্ঠ কর্ম তাঁর অমর সৃষ্টি 'মানতেকুত তাইর'।

বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাবুর শহরে ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে আত্তারের জন্ম এবং ১২২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিশাবুরেই ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর দিনক্ষণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। ইরানের বিখ্যাত পণ্ডিত মরহুম ফোরুযানফারের গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন, আত্তার ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে নিশাবুরের কাদকান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল সৈনিকের হাতে নিহত হন। অপর দিকে ইরানের খ্যাতিমান সাহিত্য ও ইতিহাসবিদ সাঈদ নাফিসির বর্ণনা মতে, তিনি ৫৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি যে প্রায় শত বছর বেঁচে ছিলেন এ বিষয়ে সকল জীবনীকারই একমত। তরুণ বয়সেই হজ করেছেন আত্তার। জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করেছেন মিশর, দামেস্ক, ভারতসহ আরও অনেক দেশ। ভ্রমণ শেষে নিশাবুরেই স্থায়ী হন এবং ইরানে মঙ্গোলদের অভিযানের সময় এক মঙ্গোল সৈনিকের হাতে নিহত হন কবি। নিশাবুরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আত্তারের শৈশব কাটে ইরানে তাতারদের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের সময়ে। তাতারদের হত্যাযজ্ঞে যখন সমগ্র পারস্য এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়, সে সময়ে আত্তারের বয়স মাত্র ৬ কিংবা ৭ বছর। এই হত্যাযজ্ঞ এতটাই নৃশংস এবং ভীতিকর ছিলো যে, আত্তারের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দুঃসহ স্মৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে আত্তার তাঁর চারপাশে যে নির্যাতন, আগ্রাসন, ধ্বংস, মৃত্যু এবং নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই-ই তাঁকে পরবর্তীতে মৃত্যু-চিন্তা এবং যন্ত্রণা-ভাবনায় বেদনাকাতর করে তোলে। এই নৃশংসতা কিছুটা স্তিমিত হওয়ার ক'বছর পর আত্তার স্থানীয় মক্তবে লেখা-পড়ায় নিমগ্ন হন। এ সময় তিনি আব্বাস তুসি, মোজাফ্ফার এবাদি, রুকনুদ্দিন আকাফ, মোহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া প্রমুখ ওলি ও সাধকের জীবনের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হন, যেগুলো তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁদের জীবনের ঘটনা পরবর্তীতে আত্তার তাঁর তাযকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আত্তারের দিওয়ানের ভাষ্য থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিলো মাহমুদ। প্রাচীনতম চরিতগ্রন্থগুলোতে আত্তারের পিতার নাম উল্লেখ হয়েছে ইবরাহিম বিন ইসহাক। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম ইউসুফ বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। কাদকানে 'পিরে জিরানভান্দ' নামে একটি মাজার রয়েছে, যে মাজারকে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। এরা বিশ্বাস করেন এটি আত্তারের পিতা 'শেখ ইবরাহিম'-এর মাজার।

আত্তার শৈশব এবং তারুণ্যেই পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিক্হ, তাফসির, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পৈত্রিক পেশা হিসেবে 'আত্তারি' অর্থাৎ ভেষজ চিকিৎসা এবং সুগন্ধি বিক্রয়ের পেশাকেই স্বীয় পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সে কারণেই তিনি স্বীয় নামের চেয়ে তাঁর পেশাগত উপাধি 'আত্তার' (ভেষজ চিকিৎসক বা সুগন্ধি বিক্রেতা) নামেই সমধিক পরিচিত। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রথম অংশ নিশাবুরের প্রাচীন শহরেই কাটে এবং মৃত্যুর আগের বাকি জীবন

তিনি নিশাবুরের নতুন শহর ‘শাদইয়াখ’-এ অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি পৈত্রিক পেশা ভেষজ চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পেশায় তিনি এতটাই সুনাম অর্জন করেন যে, বহু দূর-দূরান্ত থেকে তার বাড়ি তথা চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীরা এসে ভিড় করতো। যে সম্পর্কে আত্তার স্বীয় গ্রন্থ ‘আসরার নামে’ এবং ‘মসিবাত নামে’তে উল্লেখ করেছেন, প্রতিদিন অন্তত পাঁচশত রোগী তাঁর কাছে চিকৎিসা নিতে আসতো:

بدارو خانه پانصد شخص بودند
که در هر روز نبضم می نمودند
[চিকিৎসালয়ে ছিলো পাঁচশত লোক
যারা প্রতিদিন আমার চিকিৎসা নিতে আসতো]

আত্তার তাঁর পিতার কাছ থেকেই ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতকরণ এবং ভেষজ চিকিৎসার জাবতীয় জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। তবে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি কার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা সুস্পষ্ট করে না জানা গেলেও একথা জানা যায় যে, স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্রেই রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বলিত কাব্যচর্চায়ও করতেন। মাদ্রাসা-খানকার প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিলো না এবং রাজ-রাজাদের স্তুতি করেও তিনি কোনো কাব্য রচনা করতেন না। এই অবস্থায়ই তাঁর জীবনে বড় ধরনের এক পরিবর্তন ঘটে। নিয়মিত রোগীর সেবা ও চিকিৎসা দেয়া পরিত্যাগ করে আত্তার সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই পরিবর্তন বিষয়েও নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে আব্দুর রহমান জামীর বর্ণনাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। জামী তাঁর নাফাহাতুল উন্‌স্‌ গ্রন্থে বর্ণনা করেন: আত্তার প্রতিদিনের মতো স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগী দেখায় ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় সেখান দিয়ে এক আগুন্তক দরবেশ যাচ্ছিলো। দরবেশ বেশ ক’বার ‘শাইউল্লাহ’ ‘শাইউল্লাহ’ বলে আত্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও আত্তার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করছিলেন না। তখন দরবেশ বললো, হে খাজা, তুমি কীভাবে মৃত্যু কামনা কর? জবাবে আত্তার বললেন, যেভাবে তুমি মৃত্যু কামনা কর। দরবেশ বললো, তুমিও আমার মতো করে মৃত্যু কামনা কর? আত্তার বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনেই দরবেশ তার সাথে থাকা কাঠের পাত্রটি স্বীয় মাথার নিচে দিয়ে দোকানের সামনে সটান শুয়ে পড়ে বললো, আল্লাহ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুবরণ করলো। এই দৃশ্য দেখে আত্তারের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে এবং জগত-সংসারের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োগ করেন।

সুফিদর্শন মতে, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ইসলামি শরিয়াতের এমন স্তর যার মাধ্যমে বান্দা পার্থিব বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিতান্তই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক পথ উপলব্ধি করে একজন সুফি-সাধক সাধনার সাতটি স্তর পার হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তথা ‘বাকা’র স্তরে উপনীত হয়। নিরন্তর এই সাধনার নামই অধ্যাত্মবাদ। এশ্‌ক বা প্রেম হচ্ছে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য এবং জীবনের স্ফুরক

অবশ্য, ফারসি সাহিত্যের অনেক গবেষকই জামীর এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারণ আত্তারের তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের তথ্য মতে- শৈশবকাল থেকেই আত্তার আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই পার্থিব জীবন তথা সংসার জীবনের প্রতি তাঁর তেমন মায়া ছিলো না। তিনি ছিলেন স্বীয় পিতার শিষ্য কুতুব উদ্দিন হায়দারের শিষ্য। বাল্যকালেই আত্তার কুতুব উদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সুফি সাধনায় দীক্ষা লাভ করেন। তবে ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই বিধায় তিনি চিকৎসা পেশা এবং আধ্যাত্মিক সাধনা সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ‘আসরার নামে’ এবং ‘এলাহি নামে’ গ্রন্থ দুটিও তিনি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত অবস্থায়ই রচনা করেন। একপর্যায়ে যখন তিনি সংসার জীবন তথা পার্থিব জীবনের মায়ামুক্ত হয়ে পার্থিব সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, সম্ভবত এই সময়েই জামীর গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বোক্ত দরবেশের ঘটনাটি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও অধিকাংশ গবেষকের মতে আত্তার দির্নিষ্ট কোনো মুর্শিদের কাছ থেকে সুফিতত্ত্বে দীক্ষা লাভ করেননি, তবে কোনো কোনো গবেষক এই মতের সাথে একমত নন। আত্তারের সবচেয়ে প্রাচীনতম জীবনীকার কবি ও সুফি নূরুদ্দিন আব্দুর রহমান জামী আত্তারকে শেখ নাজমুদ্দিন কোবরার শিষ্য শেখ মাজদুদ্দিন বাগদাদীর শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আত্তার তাঁর তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের শুরুর দিকে মাজদুদ্দিন বাগদাদীর সাথে স্বীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি যে মাজদুদ্দিনের শিষ্য ছিলেন সে বিষয়ে এখানে তিনি বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

সারকথা হচ্ছে, আত্তার জীবনের একটি বৃহদাংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান আরেফ তথা সুফি সাধকদের সান্নিধ্যে কাটান এবং এসব সাধকের সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র ভূমি মক্কা থেকে মাওয়ারাউন্নাহার পর্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এমনি এক সফরের এক পর্যায়ে মাজদুদ্দিন বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন। বলা হয়ে থাকে- ভূবনবিখ্যাত সুফি কবি মাওলানা জালাল উদ্দিনের পিতা বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ, রুমির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সপরিবারে কুনিয়ার উদ্দেশ্যে বালখ ত্যাগ করেন। বাহাউদ্দিন পথে ওয়াখশ এবং সমরকান্দে কিছুদিন কাটিয়ে নিশাবুরে আসেন। এখানে কবি ও আধ্যাত্মিক সাধক শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আত্তার বালক রুমির জন্য বিশেষ দোয়া করেন এবং তাঁকে তাঁর রচিত ‘আসরার নামে’ গ্রন্থের একটি কপি উপহার দেন। ভবিষ্যতে রুমি একজন কামিল ব্যক্তি বা আধ্যাত্মিক সাধক হবেন বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন।

সুফিদর্শন মতে, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের এমন স্তর যার মাধ্যমে বান্দা পার্থিব বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিতান্তই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক পথ উপলব্ধি করে একজন সুফি-সাধক সাধনার সাতটি স্তর পার হয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তথা ‘বাকা’র স্তরে উপনীত

হন। নিরন্তর এই সাধনার নামই অধ্যাত্মবাদ। এশ্‌ক বা প্রেম হচ্ছে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য এবং জীবনের স্ফুরক (ফবঃড়হধঃড়ৎ) আর তাসাওউফ বা অধ্যাত্মবাদের উৎসের কাঁচামাল, জগতের মহান কর্মসমূহের উৎসস্থলের গোপন ভেদ এবং সাধক পুরুষের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার চূড়ান্ত অবস্থার মূল ভিত্তি। সুফিতত্ত্বের ভাষায় 'মোহাব্বত' বা ভালোবাসা যখন পূর্ণতায় পৌঁছে তখন তাকে বলা হয় 'এশ্‌ক' বা প্রেম এবং প্রেম যখন পূর্ণতায় পৌঁছে তখন 'আশেক' বা প্রেমিক 'মাশুক' বা প্রেমাস্পদের সত্তায় 'ফানা' বা বিলীন হয়ে যায়। পরম প্রেমাস্পদের প্রেমে প্রেমিকের বিলীন হওয়াই এশ্‌ক বা প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি। প্রেম আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই মাক্বাম বা পর্যায় কেবল ইনসানে কামেল বা একজন পরিপূর্ণ মানুষ, যিনি উন্নতি এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির সবগুলো স্তর অতিক্রম করেছেন তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন।

আত্তার নিজে অধ্যাত্মবাদের এই মহান সাধনায় আত্মনিয়োগের পাশাপাশি সুফি দর্শনের এই জটিল তত্ত্বকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে সাবলীল ও সরল ভাষায় গদ্যে-পদ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। আত্তারের রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা নিয়েও ফারসি সাহিত্যের গবেষক-সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রেজাকুলি খান হেদায়াতের মতে, আত্তারের সম্পৃক্ত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১৯০টি। কাজি নূরুল্লাহ শোশতারির মতে এ সংখ্যা ১১৪টি এবং দৌলতশাহ্‌র মতানুসারে ৪০টি। আত্তারের রচনাবলী সম্পর্কে দৌলতশাহ্‌ বলেন: আত্তারের মাসনাভি কাব্য ছাড়াও তাঁর দিওয়ানে চল্লিশ হাজার বেইত বা শ্লোক রয়েছে। এছাড়া, তিনি বার হাজার রুবায়ি রচনা করেছেন এবং সুফি সাধকদের জীবনীভিত্তিক তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: আসরার নামে, এলাহি নামে, মসিবাত নামে, জাওয়াহেরুজ্জাত, ওসিয়াত নামে, মানতেকুত তেইর, বুলবুল নামে, হায়দার নামে, শুতুর নামে, মুখতার নামে, শাহনামে প্রভৃতি। এর বাইরে তিনি আরও কিছু কাব্য রচনা করেছিলেন, যেগুলো কালের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। কাসিদা, গজল, মোকাত্তায়াত, রুবায়ি এবং মাসনাভি মিলে এখনো আত্তার রচিত একলক্ষ বেইত বা শ্লোকের অধিক রচনা বিদ্যমান।

অবশ্য ইরানের খ্যাতিমান ফারসি সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক সাঈদ নাফিসি বলেন, যে ৬৬টি গ্রন্থ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত বলে প্রচলিত মত বিদ্যমান তার মধ্যে মাত্র ১২টি গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থ হচ্ছে নয়টি। যথা: মানতেকুত তেইর, আসরার নামে, এলাহি নামে, পান্দ নামে, খসরু নামে, মুখতার নামে, মসিবাত নামে, তাযকিরাতুল আউলিয়া এবং দিওয়ানে আত্তার।

দিওয়ানে আত্তার মূলত তাঁর কাসিদা এবং রুবায়ির সংকলন। এর বেইত সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। আত্তারের দিওয়ান তাঁর আবেগময় আধ্যাত্মিক কবিতাসমূহের ধারক। যেগুলোতে আত্তার স্বীয় প্রেমাস্পদ পরম স্রষ্টার রহস্যাবলী কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আত্তারের গজল আবেগ ও উদ্দীপনাপূর্ণ। তাঁর কাসিদার বেশিরভাগই উপদেশ ও নসিহতে পূর্ণ। এসব কাব্যে আত্তার শ্রোতা এবং পাঠকদের পার্থিব জগতের মোহ ত্যাগ করে পরকাল তথা

আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের অসারতা ও নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আত্তারের গজলের বেইতগুলো পরস্পর সন্নিবেশিত। সাধারণত এগুলোর সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ চিন্তা-দর্শনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ভাষা সহজ-সরল ও সাবলীল। তবে বিশুদ্ধ শব্দসম্ভার ও অলঙ্কারপূর্ণ কাব্যবিন্যাস তাঁর কাব্যমানকে উন্নত শৈলীতে পৌঁছে দিয়েছে।

আত্তারের মাসনাভিগুলো নানা কাহিনী ও হেকায়াতে পূর্ণ। আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই মূলত আত্তার এসব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এসব কাহিনীর চরিত্রগুলোও

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের। যার ফলে এসব চরিত্রের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়।

গল্প বলার ক্ষমতা ছিলো আত্তারের সত্তাগত প্রতিভা। তাঁর এই প্রতিভা প্রথমবার পরিলক্ষিত হয় তাঁর খসরু নামে মাসনাভিতে, যেটি তিনি যৌবন বয়সেই রচনা করেছিলেন। যদিও এই কাহিনী-কাব্যে তুর্কি সম্রাটের পুত্র খসরু এবং খুজিস্তানের রাজকুমারী গুলরোখের ভালোবাসা এবং রোমাঞ্চের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তবে আত্তার এতে এতসব রূপকথা ও কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন যার ফলে এ কাহিনীকাব্যকে লোকসংস্কৃতি ও তুলনামূলক ইতিহাসের আধার হিসেবে অভিহিত করা যায়। গল্প বলার ক্ষেত্রে আত্তার ছিলেন সানায়ির চেয়েও সিদ্ধহস্ত।

আমরা যদি আত্তারের কবি-জীবনের প্রথম দিকের রচনা 'খসরু নামে' থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর অন্যসব সাহিত্যকর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে তিনটি যুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম যুগের রচনাগুলোতে অধ্যাত্মবাদ ও গল্পবলার শৈলী, এ দুইয়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়, যেগুলোতে শৈলীগত সব ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যুগের রচনাগুলোতে দেখি সৃষ্টি-কাঠামো ও সাহিত্য-শৈলীর চেয়ে আবেগ, উদ্দীপনা ও স্রষ্টার এককত্বের প্রতিই আত্তারের অধিক মনোযোগ। তৃতীয় যুগের রচনাগুলোতে কবি বয়োবৃদ্ধ। এসব রচনায় তাঁকে হজরত আলী (রাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট দেখা যায়, তাঁর চৈন্তিক শৃঙ্খলা এবং বর্ণনা-দক্ষতা তেমন একটা চোখে পড়ে না।

সুফি দর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে স্রষ্টা সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা এবং এর মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ, যাকে বলা হয় 'এরফান' বা 'মারেফাত'। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা অথবা তার নৈকট্য লাভই সুফিবাদের লক্ষ্য। সুফিমতে কোরান এবং হাদিসের একটি অন্তর্নিহীত অর্থ এবং প্রতীক রয়েছে যা এরা সরাসরি ব্যাখ্যার বিপরীত।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তিন শ্রেণির মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণির রচনাগুলোকে (অর্থাৎ মানতেকুত তেইর, এলাহি নামে, মসিবাত নামে এই শ্রেণির অন্যান্য রচনা) দ্বিধাহীনভাবে আত্তারের রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মনে করা হয়, তৃতীয় যুগের রচনাগুলোতে হয় বিকৃতি ঘটেছে অথবা এগুলো সুস্পষ্টভাবেই অন্য কারো রচনা। যেমন: মাজহারুল আজায়েব, খাইয়াত নামে প্রভৃতি। সর্বশেষ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, তৃতীয় যুগের রচনাগুলো নিশ্চয় ভিন্ন এক আত্তার কর্তৃক রচিত।

আত্তারের মাসনাভিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসনাভি হচ্ছে 'এলাহি নামে'। প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীকাব্য এমন কিছু ছোট ছোট গল্প ও কাহিনীর সমাহার, যেগুলো মূলত পিতা-পুত্রের কথোপনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পুত্র বেশকিছু অমূলক বিষয় সম্পর্কে পিতার কাছে জানতে চাইছে। পিতা সেসব বিষয়ের বাস্তবতা পুত্রের কাছে সুস্পষ্ট করছেন। আত্তার এসব কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও সামাজিক অনেক বিষয়ই বর্ণনা করছেন।

তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীকাব্য হচ্ছে 'মসিবাত নামে'। যেটিতে আত্তার আধ্যাত্মিক সাধকের নানা আত্মিক সমস্যা ও দুর্যোগ বর্ণনার পাশাপাশি বহু কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মুলত এটি আত্মার পরিক্রমণের গল্প, যাতে সাধক অদৃশ্য জগত থেকে স্বীয় ভ্রমণ-পথ অনুধ্যান করে এবং মুর্শিদের পথনির্দেশনায় পথের নানা স্তর অতিক্রম করে।

সুফিদের নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার সাতটি স্তর বিদ্যমান। আত্তার তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন রচনাবলীতে এই সাতটি স্তরকে প্রেমের শহর তথা অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পথ-পরিক্রমার সাতটি উপত্যকার সাথে তুলনা করেছেন। প্রথম উপত্যকা বা স্তর হচ্ছে 'তালব' বা অনুসন্ধান। যার মাধ্যমে সাধক বা বান্দা তাঁর অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পথ অনুসন্ধান করবে। দ্বিতীয় উপত্যকা বা স্তর হচ্ছে 'এশক' বা প্রেম। যে এশকের তাড়নায় সাধক তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে দ্রুত পদক্ষেপ ফেলবে। তৃতীয় স্তর 'মারেফাত' বা অন্তর্দৃষ্টি, যার মাধ্যমে সাধক তার সাধ্যানুযায়ী স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছার পথ খুঁজে পাবে। চতুর্থ স্তর হচ্ছে 'এস্তেগনা' বা স্বয়ম্ভরতা। সাধক বান্দা তাঁর সাধনার এই স্তরে পৌঁছে স্বীয় প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এতটাই আস্থাশীল হয়ে উঠবে যে, জাগতিক কোনো কিছুর প্রতিই সে আর কোনো পিছুটান বা মুখাপেক্ষিতা অনুভব করবে না। এই সাধনার পঞ্চম স্তর হচ্ছে 'তাওহিদ' বা একত্ববাদ। আধ্যাত্মিক সাধক তার সাধনার এই স্তরে পৌঁছে যে দিকেই দৃষ্টি দেবে সর্বত্রই মহিমায় স্রষ্টার একত্বের অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ করবে। ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে 'হায়রাত' বা বিস্ময়, বিহ্বলতা। বান্দা এই স্তরে পৌঁছে মহান স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ও ক্ষমতার অসীমতার বিপরীতে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার সসীমতা, অপ্রতুলতা এবং সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে। এই সাধনার সপ্তম বা সর্বশেষ স্তর হচ্ছে 'ফানা' বা বিলয়, বিলুপ্তি, নিশ্চিহ্নতা, অনস্তিত্ব। এই স্তরে পৌঁছে বান্দা বা সাধকের যাবতীয় মানবীয় কামনা-বাসনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে আত্মপরিচয় ও আত্মসত্তাকে বিলীন করে দিয়ে প্রকৃত প্রেমাস্পদ মহান স্রষ্টার সত্তায় একাকার হয়ে মিলিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে সে 'ফানা' বা অনস্তিত্ব পার হয়ে 'বাকা' বা অস্তিত্বে পৌঁছে। নদী যেমন মোহনায় নিজেকে বিলুপ্ত করে সাগরে গিয়ে পৌঁছে।

সুফীতত্ত্বের এই জটিল দর্শনকে রূপক গল্পের মাধ্যমে আত্তার তাঁর মাসনাভি বা দ্বিপদী কাব্য মানতেকুত তাইর-এ অত্যন্ত সরল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটি আত্তারের আধ্যাত্মিক মাসনাভিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যেটিকে আত্তারের শ্রেষ্ঠকর্ম হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। শুধু তাই নয়, এটি বিশ্বসাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ। আত্তার পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আন-নামলের ১৬ নং আয়াত থেকে এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে:

"وورث سليمن داود و قال يايها الناس علمنا منطق الطير"

[সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন এবং তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমাকে 'মানতেকুত তেইর' বা পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে]

৪২০০-এর অধিক বেইত সম্বলিত এই মাসনাভিটি মূলত একটি রূপক কাহিনীকাব্য। 'সিমোরগ' নামের এক কিংবদন্তী পাখিকে কেন্দ্র করে পাখিদের আলোচনা বা সমাবেশ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এসব পাখি দ্বারা আত্তার সত্য পথের সাধক পথিক এবং 'সিমোরগ' দ্বারা মহান স্রষ্টার অস্তিত্বকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আত্তার তাঁর এ গ্রন্থে অধ্যাত্মবাদের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে মনোরম-মধুর গল্প-সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সুফি দর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে স্রষ্টা সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা এবং এর মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ, যাকে বলা হয় 'এরফান' বা 'মারেফাত'। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা অথবা তার নৈকট্য লাভই সুফিবাদের লক্ষ্য। সুফিমতে কোরান এবং হাদিসের একটি অন্তর্নিহীত অর্থ এবং প্রতীক রয়েছে যা এর সরাসরি ব্যাখ্যার বিপরীত। সুফিমত রূপক পদ্ধতি প্রয়োগে পবিত্র কোরানের অন্তর্নিহীত তাৎপর্য এবং প্রতীক সমূহের অনুসন্ধান করে। তারা বিশ্বাস করে যে, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে হলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন যা অর্জন করতে হয় বস্তুজগতের ঘটমান নানাবিধ ঘটনার উপলব্দি থেকে। মানুষকে ইহজাগতিক প্রেম-ভালবাসা এবং লোভ-লালসার মৃত্যু ঘটিয়ে নতুন রূপে আর্বিভূত হতে হয়। সুফি মতানুযায়ী মানুষের মাঝে স্রষ্টা বিরাজমান তবে তাকে সহজে লাভ করা যায় না; এ জন্য কঠিন সাধনার প্রয়োজন। আত্তারের মতে সফরের মাধ্যমেই এই সাধনা সম্পন্ন হয়, মূলত যে সফর সম্পন্ন হয় স্বীয় অন্তর্জগতে। অন্তর্জগতে আত্মিক পরিভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার কুলবের মাঝে পরমাত্মার সন্ধান লাভ করে এবং আরেফ তথা সাধক তাঁর অন্তরাত্মায় পরমাত্মার প্রতিফলন পরিলক্ষ করে। মূলত এই তত্ত্বই আত্তার তাঁর অমর সৃষ্টি 'মানতেকুত তাইর' গ্রন্থে পাখিদের ভ্রমণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছেন।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের 'মানতেকুত তাইর'-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুফি দর্শনের সহজ ও সাবলীল ব্যাখ্যা প্রদান করা। একটি রূপক কাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে এ দুরূহ কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন। আত্তার বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ বিভিন্ন অজুহাতে স্রষ্টার অন্বেষণ এড়িয়ে যায়। তিনি মূলত দু'টি বিষয় অনুধাবন করেছিলেন; (ক) আধ্যাত্মিক অন্বেষণের প্রতিবন্ধকতা, এবং (খ) মানুষের পলায়নপর প্রবৃত্তি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের লক্ষ্যই ছিল পাঠকদের কাছে একটি আধ্যাত্মিক সফরের বয়ান করা, যে সফর মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে- যেন তাতে স্রষ্টার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। 'মানতেকুত তাইর'ও একটি সফরের বয়ান, যে সফরে পাখিরা তাঁদের বাদশাহ তথা রাজার অনুসন্ধানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। এই বাদশাহ বা রাজা মূলত স্রষ্টারই প্রতিকী রূপ। বিষয়টি তিনি একটি রূপক কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীটি এরকম-

একদিন পক্ষিকুল তাদের বাদশাহ বা শাসক নির্বাচন ও অনুসন্ধানের জন্য একত্রিত হয় এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের বাদশাহ্ বা রাজাকে খুঁজে বের করবে। জগতের সকল প্রাণী এমন কি মানবকুলেরও রাজা বা বাদশাহ থাকে। অতএব, তাদের নিশ্চয়ই একজন রাজা বা বাদশাহ আছে, এবং তাকে খুঁজে পাওয়া দরকার। তাদের সবার বক্তব্য হচ্ছে, এমন কোনো শহর নেই যে শহরের কোনো শাসক নেই। তাহলে আমাদের শাসক কে? তা অনুসন্ধান করা উচিত। সমবেত পাখিদের মধ্য থেকে হুদহুদ (কাঠ ঠোকরা)৪পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহক- বলে ওঠে: আমি সেই বাদশাহর অনুসন্ধান জানি। তার নামও জানি। তাঁর নাম 'সিমোরগ'। 'সিমোরগের' পাখিদের বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ততাও সে বর্ণনা করে এবং এও বলে যে, 'সিমোরগ'-এর আবাস সাত উপত্যকার ওপারে। তাঁর সান্নিধ্যে যেতে হলে অবশ্যই আমাদের এই সাত উপত্যকা পাড়ি দিয়েই যেতে হবে। যে যাত্রা অত্যন্ত কষ্টসঙ্কুল আর শ্রমসাধ্য, কারণ 'এ সফর দিন নয়, মাস নয়, বছর

অবধি, হয়তোবা অমৃত্যু, বিপদসঙ্কুল, সন্দেহ আর আতঙ্কের। পাখিরা হুদহুদকে সফরের নেতা নির্বাচন করে, তার বিশেষ মর্যাদার জন্য। কারণ তারা জানে যে, হুদহুদ বাদশাহ সোলায়মানকে মরুভূমিতে পথ দেখিয়ে শেবা'র রানি বিলকিসের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। অতএব, এ সফরের নেতৃত্ব তারই প্রপ্য। উল্লেখ্য, আত্তার এখানে পাখিদের দ্বারা সত্য পথের অনুসন্ধানী সাধকদের, হুদহুদ বা কাঠ ঠোকরা পাখি দ্বারা সেই পথের পথনির্দেশক মুর্শিদকে এবং 'সিমোরগ' দ্বারা চিরসত্য মহান স্রষ্টাকে বুঝিয়েছেন। আর সাত উপত্যকা দ্বারা উপরোল্লিখিত আধ্যাত্মিক সাধনার পথপরিক্রমার সাতটি স্তরকে বুঝিয়েছেন, যা উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি মানুষে পরিণত হতে হয়। আর হুদহুদ এখানে মূলত সুফি শেখ বা মুর্শিদের প্রতীকি চরিত্র যারা তাদের অনুসারীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনে সহায়তা করে থাকে।

অনেক পাখি কষ্ট আর শ্রমের কথা শুনে এই দীর্ঘ সফরে রওনা হতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এবং নানা অজুহাতে সফর এড়িয়ে যেতে চায়। তাদের প্রতিটি অজুহাত মূলত মানুষের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের অনিচ্ছাকেই প্রতীকায়িত করে যা মূলত পার্থিব জগতের প্রতি মানুষের ব্যাপক আসক্তি ও আগ্রহ, যেগুলোর প্রত্যেকটি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অভিযাত্রার সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে নানা ওজর-আপত্তির পরও হুদহুদের কথা মতো পাখিরা 'সিমোরগ'র সান্নিধ্য লাভের যাত্রায় যুক্ত হয়। এই অভিযাত্রার প্রাক্কালে আত্তার এ পথের বিপদসঙ্কুলতা এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে শেখ সানায়ানের কাহিনীরও অবতারণা করেছেন। হুদহুদ পথের বিপদাপদ সম্পর্কে পাখিদের অবহিত করে এবং তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, 'সিমোরগ'র আবাস পর্যন্ত সে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের পরিক্রমণ-আগ্রহ থাকতে হবে এবং দূর পথ পরিক্রমণে যে নানা রকম কষ্টক্লেশ আসবে তাও সহ্য করতে হবে। কিন্তু পথিমধ্যে অধিকাংশ পাখিই নানা ওজর-আপত্তি ও বাহানা উপস্থাপন করে এই কষ্টযাত্রা থেকে পালিয়ে যায়। যেমন: ফুলপ্রেমিক বুলবুল অজুহাত পেশ করে বলে, সে তার সঙ্গী আর গোলাপের প্রতি ভালবাসায় তুষ্ট, তাছাড়া এ দীর্ঘ যাত্রা তার সামর্থ্যরে বাইরে। সে বলে:

در سرم از عشق گل، سودا بس است
زانکه مطلوبم، گل رعنا بس است
طاقت سيمرغ، نارد بلبلي
بلبلي را بس بود، عشق گلي

[আমার মাথায় ফুলের প্রেম, এই লেনদেনই যথেষ্ট
আমার উদ্দিষ্ট দৃষ্টিনন্দন ফুল এই তো যথেষ্ট
'সিমোরগ'-এর সান্নিধ্য-ক্ষমতা বুলবুলের নেই
বুলবুলের জন্য ফুলের ভালোবাসাই ছিলো যথেষ্ট]

সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মাকে এতটাই পরিশুদ্ধ করতে হবে যেন তা এমন স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয় যার মধ্যে স্রষ্টার অবয়বের প্রতিফলন ঘটানো যায়। সুফি দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার সপ্তম ধাপে মানুষের আত্মা স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয়। এধাপেই মানুষ স্বর্গীয় প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজে তার অংশ হয়ে যায়।

জবাবে হুদহুদ তাকে ইহজাগতিক প্রেমের দাসত্ব যে স্রষ্টার সান্নিধ্য আর আত্মশুদ্ধি লাভের পথে অন্তরায় এ কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলে:

گل اگرچه هست بس صاحب جمال
حسن او در هفته اي گيرد زوال
عشق چيزي كان زوال آرد پديد
كاملا را زان ملال آرد پديد
خنده گل گرچه در كارت فكند
روز و شب، در ناله زارت فكند
در گذار از گل، كه گل هر نوبهار
بر تو مي خندد، نه در تو، شرم دار

[যদিও ফুল যথেষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারী
তবে তার সৌন্দর্য এক সপ্তাহেই হয় বিলীন
ভালোবাসা এমন বস্তু যা সৃষ্টি করে অবক্ষয়
সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি করে পূর্ণতাকে
ফুলের হাসি যদিও তোমার কাজে নিক্ষিপ্ত
দিবানিশি, তোমার ক্রন্দনরোলে নিক্ষিপ্ত
ছাড় ফুলের কথা, ফুল তো প্রতি নববসন্তে
তোমার ওপর হাসে, তোমার ভেতরে নয়, লজ্জা কর (এমন অজুহাতে)]

ময়ূর এই বলে অজুহাত দেখায়:

كي بود سيمرغ را، پرواي من
بس بود فردوس اعلي، جاي من
من ندارم در جهان كاري دگر
تا بهشتم ره دهد، باري دگر

[কিসের পরোয়া ছিলো আমার 'সিমোর-গ'-অন্বিষ্ট
সুউচ্চ ফেরদৌসই আমার স্থান, এইতো ছিলো যথেষ্ট
জগতে আমার আর তো নেই কোনো কারবার
যেন আমায় বেহেশতে স্থান দেয় পুর্নবার]

হুদহুদ তাকে উপদেশ দিয়ে বলে:

چون به دريا مي تواني راه يافت
سوي يک شبنم، چرا بايد شتافت
...
گر تو هستي مرد كلي، كل ببين
كل طلب، كل باش، كل شو، كل ببين

[যখন তুমি সমুদ্র-মুখে পথ পেতে পার
কেন তবে শিশির বিন্দু-মুখে ছোটাছুটি কর
যেহেতু তুমি পূর্ণতার অস্তিত্ব, তাই পূর্ণতাকেই দেখ
পূর্ণ অনুসন্ধান কর, পূর্ণ থাক, পূর্ণ হও, পূর্ণতাকেই দেখ]

তোতা বলে সে তার প্রাণটা হারাতে চায় না, তার চেয়ে বরং মৃত্যুর

পরেই স্বর্গে যাবে সে। রাঁজহাস পানির প্রতি এতটাই আকৃষ্ট যে, সে সীমোরগের কাছে যায় কিভাবে। তিতির রত্নকে ভালোবেসে যাত্রা থেকে পিছিয়ে যেতে চায়। হুদহুদ তিতিরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রত্ন আসলে রঙিন পাথর ছাড়া কিছুই না। এর প্রতি ভালোবাসা অন্তরকে কঠিন করে ফেলে। তার প্রকৃত রত্ন খোঁজা উচিৎ। হুমা অহঙ্কারী, পেঁচা তিতিরের মতো ইহজাগতিক জিনিসের নেশায় মগ্ন। সারস সাগরের প্রতি মোহাবিষ্ট। হুদহুদ চড়ুইকে তার হীনমন্যতার জন্য তিরস্কার করে, নিজেকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে পরামর্শ দেয়। হুদহুদের মতে বিভিন্ন ধরনের পাখি আসলে সীমোরগের-ই ছায়া। সীমোরগকে পেতে হলে নিজেকে অবশ্যই নিজের সত্তার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। নিজের আত্মপরিচয়কে বিলীন করে দিতে হবে। তাই সে তাদের বলে, তোমরা যদি ইহজগত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পার তাহলেই কেবল সুখের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবে। এভাবে প্রতিটি দ্বিধান্বিত পাখিকে হুদহুদ (প্রকৃত অর্থে কাহিনিকার আত্তার) নানা নীতিকথা এবং স্মরণীয় কাহিনী শুনিয়ে পাখিদের আশ্বস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ রাবিয়া আল-আদাইয়া, আবু সাঈদ আবিল খায়ের, মনসুর হাল্লাজ, শিবলী প্রমুখের ন্যায় প্রাক্তন সুফি সাধকদের প্রসঙ্গও টেনে আনে। উল্লেখ্য, এই কাহিনীতে প্রতিটি পাখি এবং তাদের পলায়নপর মনোভাব মূলত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতীকায়ন।

অবশেষে সীমোরগের সন্ধানে হাজার পাখি সফর শুরু করলেও অনেকেই যাত্রা পথে ঝরে যায়, মাত্র ৩০টি পাখি সীমোরগের দরবারে যেতে সক্ষম হয়। ততদিনে দীর্ঘ পথযাত্রায় তাদের সবার ডানা ভেঙে গেছে, পালক ঝরে গেছে, তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, শ্রান্ত, অর্ধমৃত। পাখিরা সীমোরগের দরবারে গিয়ে কেবল একটি সিংহ-াসনে বিশাল একটা আয়না ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পায় না। সেই আয়নার দিকে এগিয়ে গেলে প্রতিফলনে তারা নিজেদের অবয়বই দেখতে পায় এবং সেখানে তারা নিজেদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে বিস্মিত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। মহাশক্তিধর 'সিমোরগ'-এর কাছে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন (ফানা) করে দেয়। এভাবে বেশ ক'বছর কেটে যায়। তারপর তারা ফানা থেকে 'বাকা' বা অবিনশ্বরতার আভরণ পরে তাদের বাদশাহর দরবারে গৃহীত হয়। এইখানে তাদের কাছে মনে হয় তারা যেন স্বচ্ছ পানিবেষ্টিত একটি উপত্যকা অথবা একটি আয়নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তারা 'সিমোরগ'কে চাক্ষুস করতে চায় তখন তারা যে সিমোরগ বা ত্রিশ পাখি ছিলো তাদেরকেই দেখতে পায়। যে দৃশ্যের বর্ণনা আত্তার তাঁর মানতেকুত তাইরে এভাবে দিয়েছেন:

چون نگه کردند آن سي مرغ زود
بي شک آن سيمرغ آن سي مرغ بود
در تحير جمله سرگردان شدند

مي ندانستند اين يا آن شدند
خويش را ديدند سيمرغ تمام
بود خود سي مرغ، سيمرغ مدام

[যখন সহসাই ওই ত্রিশ পাখি (সি মোরগ) তাকালো

(দেখে) সন্দেহাতীত ওই 'সিমোরগ' সেই ত্রিশ পাখিই (সি মোরগ) ছিলো

বিহ্বলতায় সবাই বিস্ময়-বিমুঢ় হলো

তারা জানতো যে, এ-ই অথবা সে-ই হয়েছে

নিজেদের দেখলো তারা পূর্ণ 'সিমোরগ'

ছিল স্বয়ং ত্রিশ পাখি (সি মোরগ) অবিনশ্বর 'সিমোরগ']

তারা বুঝতে পারে যে, তাদের এ সফর ছিল আসলে আত্ম-উপলব্ধির জন্য। পাখিদের এ আত্ম-উপলব্ধির সময় আকাশের

ঘোলাটে আলোয় স্থানটি পূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় উঁচু থেকে মহাজাগতিক আলোর প্রক্ষেপণ ঘটছে এবং দরবারে উপস্থিত ৩০টি পাখি সেই আয়নার মাঝে ঝাপ দিয়ে বিলীন হয়ে যায়। সুফি মতে যাকে বলা হয় 'ফানা' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অবস্থান করা। বস্তুতপক্ষে, তারা এটা উপলব্ধি করতে পারলো যে, এই 'সিমোরগ' আসলে ওই ত্রিশ পাখিই। অর্থাৎ তারা অজ্ঞাতসারে বাইরের জগতে যে সত্তাকে অনুসন্ধান করছিলো সেই সত্তাকে তারা স্বীয় অন্তরেই খুঁজে পেয়েছে।

ফারসি ভাষায় 'সি' অর্থ ত্রিশ (৩০) আর মোরগ অর্থ পাখি, অর্থাৎ 'সি মোরগ' অর্থ 'ত্রিশ পাখি'। সিমোরগ বলতে বিশেষ কিছু নেই, প্রতিটি পাখি-ই 'সিমোরগ' আর প্রতিটি 'সিমোরগ'-ই পাখি– যদি তারা সুফি দর্শনের সাতটি ধাপ অতিক্রম করতে পারে। আত্তার যাকে রূপকার্থে 'সপ্ত উপত্যকা' বলেছেন। আমাদের আত্মার প্রতিটি কোণ আলোকিত করার জন্য মনের আয়নায় আলোর প্রতিফলন দরকার, যেন আমরা আমাদের সত্তার ভেতরে লুকায়িত সম্পদ খুঁজে পাই। যেন আমরা আমাদের মাঝে পরিভ্রমণ করতে পারি এবং নিজেকে জানতে পারি। আর এ আত্মজ্ঞান মানুষকে পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।

সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মাকে এতটাই পরিশুদ্ধ করতে হবে যেন তা এমন স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয় যার মধ্যে স্রষ্টার অবয়বের প্রতিফলন ঘটানো যায়। সুফি দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার সপ্তম ধাপে (চড়াবৎঃ ধহফ ঘড়ঃযরহমহবংং) মানুষের আত্মা স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয়। এ ধাপেই মানুষ স্বর্গীয় প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজে তার অংশ হয়ে যায়। আত্তারের মতে, সিমোরগ আমাদের ভেতরে একটি আয়না দিয়ে দিয়েছেন তার প্রতিফলন দেখার জন্য, আর সে আয়না হচ্ছে আমাদের অন্তর। অন্তরের মাঝে তাকালে আমরা তার স্বরূপ দেখতে পারি কিন্তু সেজন্য আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হবে। আর এই পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রেমময় সফর।

এ গ্রন্থের চমৎকারিত্ব হচ্ছে, পাখিদের বাদশাহ কিংবদন্তী পাখি 'সিমোরগ' এবং অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছা ত্রিশ পাখি, ফারসিতে 'সি মোরগ', এই দুইয়ের চমৎকার অনুপ্রাস। যার দৃষ্টান্ত শুধু ফারসি সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। এই বিরল কাহিনীকাব্য, যা কবির উন্নত সৃজনদক্ষতা ও কবিকল্পনার ধারক এবং অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় রহস্যাবলীর সহজ-সরল ও সাবলীল বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার আধার, ফারসি সাহিত্যের কালজয়ী শ্রেষ্ঠকর্মগুলোর অন্যতম। আত্তারের মানতেকুত তেইর-এর মূল শিক্ষা হিসেবে আমরা দেখি, শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই নয় বরং পার্থিব জীবনের নানারূপ সাফল্যে পৌঁছার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির কঠিন সাধনা বাঞ্ছনীয়। আর সেই সাফল্যে পৌঁছার আগে লক্ষ্য স্থির করা অবশ্যম্ভাবী। আর লক্ষ্য স্থির করার পূর্বেই আসে ইপ্সিত লক্ষ্যের শুভাশুভ অনুসন্ধান। অধ্যাত্মবাদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'তালব'। সুতরাং একথা দৃঢ়চিত্তেই বলা যায় যে, আত্তারের মানতেকুত তেইর শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার পথের অভিযাত্রীদের জন্যই নয়, বরং জগতের সকল সাফল্যকামী মানুষের জন্যই অবশ্যপাঠ্য এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর সেকারণেই হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মানতেকুত তাইর অনূদিত হয়ে পঠিত এবং সমাদৃত হচ্ছে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।

জিয়ারতকারী ও পর্যটকদের কাছে যে কারণে জনপ্রিয় গন্তব্য ইরানের মাশহাদ

ইরানের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর মাশহাদ। শহরটি ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মাশহাদ মূলত খোরাসান-ই রাজাভি প্রদেশের রাজধানী। এটি উত্তর-পূর্ব ইরান এবং তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থি

মাশহাদ একসময় প্রাচীন সিল্ক রোড বরাবর প্রধান মরূদ্যান শহর ছিল। আফশারিদ রাজবংশের সময় এটি ইরানের রাজধানীও ছিল। মাশহাদ ইরানের সবচেয়ে বিখ্যাত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক পর্যটকের সমাগম

ইমাম রেজার পবিত্র মাজার

ঘটে। প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ এই শহরে বেড়াতে আসেন।

মাশহাদে প্রচুর বিলাসবহুল হোটেল, ঐতিহ্যবাহী হোটেল এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা হোটেল গড়ে ওঠায় দেশি-বিদেশি পর্যটকরা খুব সহজেই শহরটিতে অবকাশ যাপন করতে পারেন।

ইমাম রেজার পবিত্র মাজার

মাশহাদ শহরে ইমাম রেজার (আ.) মাজারটি ইরানি-ইসলামিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মাজারটি আহলে বাইতের অষ্টম ইমামের সমাধি। ইমাম রেজার (আ.) মাজার একটি সুন্দর এবং প্রশান্তির স্থান। বিদেশি এবং ইরানি জিয়ারতকারীরা সবসময়ই এখানে ভিড় জমান।

মাজারটি একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক স্থান ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে অত্যন্ত সুবিশাল এবং অনুকরণীয়। এটি বেশ কয়েকটি প্রাঙ্গণ নিয়ে গঠিত এবং এর টাইলিং এবং সাজসজ্জার সৌন্দর্য প্রতিটি জিয়ারতকারীর নজর কাড়ে।

কুহ সাঙ্গি পাক

কুহ সাঙ্গি পার্ক মাশহাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্ক (মেল্লাত পার্কের পরে)। এই পার্কটি মাশহাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কুহ সাঙ্গি স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উঁচু পাহাড়ের ধারে কুহ সাঙ্গি পার্ক তৈরি করা হয়। এই জায়গাটি মাশহাদের প্রাচীনতম এবং অন্যতম বিখ্যাত বিনোদন কেন্দ্র। ইরানের সবচেয়ে সুন্দর পার্কগুলোর মধ্যেও এটি একটি। এই পার্কটি জল, পাথর, সবুজ এবং আলোর সংমিশ্রণে নির্মাণ করা হয়েছে।

কাঙ গ্রাম

কাঙ গ্রামটি বিনালাউদ পর্বতের পাদদেশে তারকাবে থেকে ১৯ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং মাশহাদ থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন গ্রামটি ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক গ্রামটি এখন ইরানি এবং বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় একটি গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত।

নাদির শাহ আফসারের সমাধি

একদিকে নাদির শাহের সমাধির দুর্দান্ত স্থাপত্য। অন্যদিকে রয়েছে নাদেরি মিউজিয়াম। এই দুই স্থাপনা মিলে কমপ্লেক্সটিকে মাশহাদের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করেছে।

জাদুঘর ভবনটিতে আকর্ষণীয় স্থাপত্য, ঐতিহাসিক এবং মূল্যবান বস্তু যেমন বিভিন্ন যুগের অস্ত্র রয়েছে। নাদির শাহ আফসারের সমাধি মাশহাদে অবস্থিত।

এই জাদুঘর এবং সমাধিটি অবস্থিত একটি সুন্দর বাগানে। দৃষ্টিনন্দন বাগান এলাকাটির আকর্ষণকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

দারুগে ঐতিহাসিক বাড়ি

মাশহাদের দারুগে ঐতিহাসিক হাউজটি একটি দর্শনীয় বাড়ি এবং এটি ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান। এর সুন্দর প্রাচ্য-স্থাপত্য সহ একটি দুর্দান্ত কাঠামো রয়েছে যা ইরানি এবং রুশ স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

কাজার আমলে নির্মিত এই বাড়িটির আয়তন ১১শ বর্গ মিটার। আকর্ষণীয় বাড়িটি রাস্তার স্তর থেকে প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার নিচে অবস্থিত। দারুগে বাড়ির উঠানে একটি সুন্দর পুকুর এবং দুটি ছোট বাগান রয়েছে, যা পর্যটকদেও বিশেষভাবে নজর কাড়ে।

ওয়াটার ওয়েভস ল্যান্ড

ওয়াটার ওয়েভস ল্যান্ড মাশহাদের দেখার মতো জায়গাগুলোর মধ্যে একটি। ২০০৬ সালে এটি চালু করা হয়। এই পার্কটি ইরানের প্রথম ওয়াটার পার্ক। প্রতিষ্ঠার সময় এটি ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম ইনডোর ওয়াটার পার্ক ছিল।

কমপ্লেক্সটির আয়তন আট হাজার ৫০০ বর্গমিটার। এতে নারী ও পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। ওয়াটার ওয়েভস ল্যান্ড ইরান এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা ওয়াটার পার্ক যেখানে নানা রকমের সুবিধা রয়েছে।

ফেরদৌসির সমাধি

পৃথিবীর বুকে বিশ্ববিখ্যাত যে ক'জন কবির আগমন ঘটেছে ফেরদৌসীর নাম তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর পুরো নাম হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসী তুসি। প্রাচ্যের 'হোমার' খ্যাত ফারসি সাহিত্যের এই মহান কবি ছিলেন ইরানের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাথার সার্থক রূপকার। যে কারণে তাঁর জীবনকাহিনী রূপকথার ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বীরত্বগাথা শাহনামা রচনার মাধ্যমে তিনি ইরানিদের জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর এ কালোত্তীর্ণ বীরত্বগাথা শাহনামা গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাষাগুলোতে অনূদিত হয়েছে এবং অসংখ্য সাহিত্যামোদীর মনের খোরাক যুগিয়েছে।

ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি গোটা পারস্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কবি ফেরদৌসির গুরুত্ব ও আবেদন কেবল তাঁর ভাষার লালিত্য, মাধুর্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বীরদের কাহিনী বর্ণনার মধ্যেই নিহিত নয়, বরং তাঁর জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় চেতনার মাঝেও বিদ্যমান। তাঁর রচিত শাহনামা গ্রন্থের পরতে পরতে গল্পের কাহিনীগুলো এমনিভাবে বিধৃত হয়েছে যে প্রতিটি চরিত্রই যেন একেক জন পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করছে। যে কারণে এ মহাকাব্য সাহিত্যের একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। তিনি প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিপরীতে অন্তর্নিহিত বর্ণনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন আর এটি ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত শৈলী। এ ধরনের সাহিত্যশৈলী ফারসি সাহিত্যে বিরল। তিনি তাঁর শাহনামা কাব্যগ্রন্থকে ধ্বনি, শব্দ চয়ন, এমনকি ব্যাকরণসহ সকল স্তরে একটি সুশৃঙ্খল গঠন কাঠামোর মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন। যার ফলে এটি ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত অবস্থানে রয়েছে।

তাই ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবির সমাধিস্থল বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ফেরদৌসির সমাধি মাস্টার মোহাম্মদ রেজা শাজারিয়ান (মহান ইরানী গায়ক) এবং বিখ্যাত ইরানি কবি আখাওয়ান সেলসের সমাধির কাছে একটি বাগানে অবস্থিত।

স্যুভেনির (স্মৃতিচিহ্ন)

ইরানের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় শহর হিসেবে মাশহাদের নিজস্ব স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভোজ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে সহজ কারুশিল্প। মাশহাদের সেরা স্যুভেনিরগুলো হলো: জাফরান, বারবেরি, বাদাম, জেলি বিন, ফিরোজা, মিষ্টি, ক্যান্ডি, নাবাত, সুগন্ধি, সিল এবং প্রার্থনার গালিচা ও তাসবিহ।

জাফরান

জাফরান একটি সুন্দর, রঙিন এবং সমৃদ্ধ মসলা। ইরানে এর চাষ প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। ইরানের রাজাভি এবং দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরে, বিশেষ করে গায়েনাতে এই মূল্যবান উদ্ভিদ চাষ হয়। মাশহাদেও প্রচুর পরিমাণে জাফরান চাষ হয়। আপনি মাশহাদে এই লাল সোনা কিনতে পারবেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের জাফরান বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন!

তিন হাজার বছরের পুরানো কানাত ইরানের নতুন পর্যটন আকর্ষণ

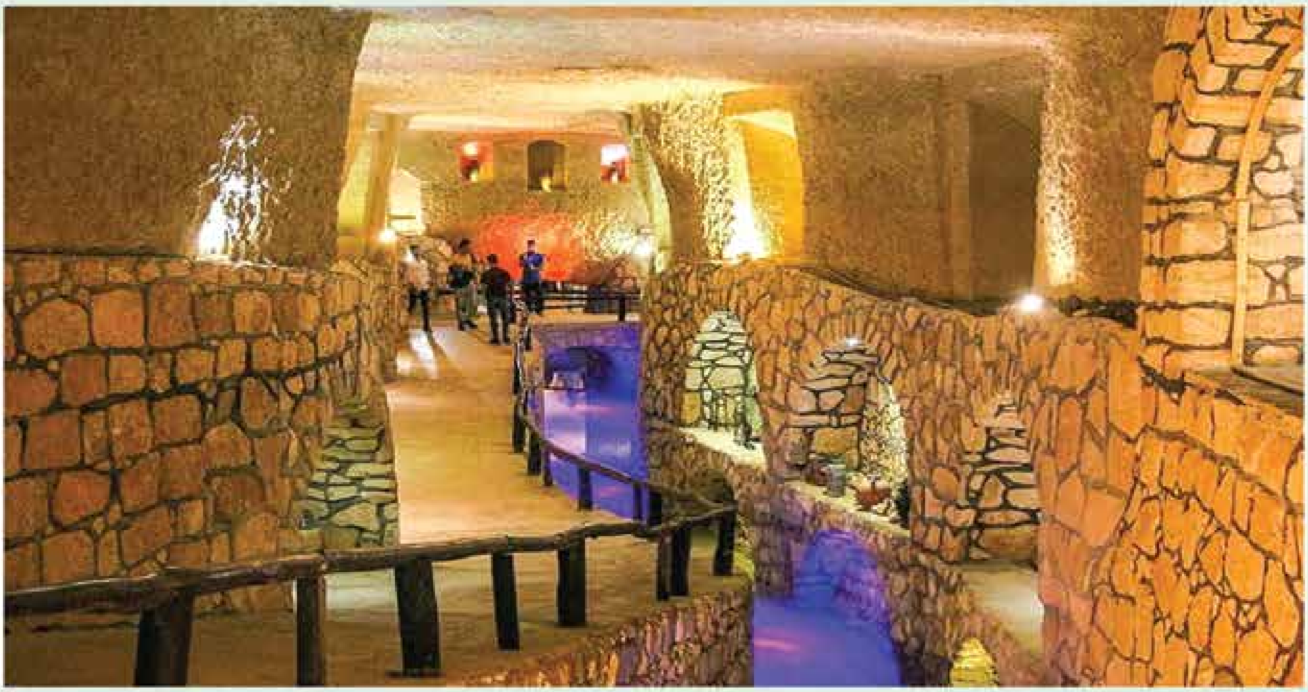

মধ্য ইরানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ৩ হাজার বছরের পুরনো ভূগর্ভস্থ পানির চ্যানেল। এটির নাম কানাত-ই জারচ। বর্তমানে প্রাচীন এই বিস্ময়কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এটিকে এই অঞ্চলে পর্যটন সম্ভাবনা বাড়ানোর একটি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দেখা হয়।

জারচের গভর্নর মর্তেজা জিবিয়ানের মতে, এই উচ্চাভিলাষী উদ্যোগটি যেমন ঐতিহাসিক একটি সম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করবে, ঠিক তেমনি স্থানীয় অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে।

৩ হাজার বছরের পুরানো কানাত-ই জারচকে পুনরুজ্জীবিত করার সুদূরপ্রসারী সুবিধাগুলো তুলে ধরে গভর্নর একই সাথে পর্যটনের সুযোগগুলোকে প্রসারিত করার সাথে সাথে স্থানীয় অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করার সম্ভাবনার ওপর জোর দেন।

বিশ্বব্যাপী মানবসৃষ্ট সবচেয়ে অসাধারণ জলাশয় হিসেবে মর্যাদা পাওয়া জারচের এই কানাতটি মধ্য ইরানের ইয়াজদ প্রদেশের আধা-শুষ্ক ভূমির মধ্যে দিয়ে ৮০ কিলোমিটার বিস্তৃত।

ইয়াজদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ফাহরাজ গ্রাম থেকে চ্যানেলটি শুরু হয়েছে। কানাতটি ভূপৃষ্ঠের ৩০-৪০ মিটার গভীরে। ফাহরাজ থেকে জারচে পৌঁছানো পর্যন্ত আঁকা-বাকা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এ চ্যানেলট। এটি এই অঞ্চলের মূল্যবান পানির উৎস নিম্ন ভূখণ্ডের সেচ ব্যবস্থা। ফলে উর্বর জমির লালন এবং স্থানীয় কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই কানাতটি।

ইরানের প্রাচীন সাব-সারফেস ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমের (যা কানাত নামে পরিচিত) ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১ লাখ ২০ হাজার কানাতের মধ্যে প্রায় ৩৭ হাজার এখনও চালু আছে। এই স্থিতিস্থাপক পানির চ্যানেলগুলো সারা দেশে শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক অঞ্চলে মানব সম্প্রদায়ের সেবা করে চলেছে।

ইসমাইল হানিয়ার শাহাদাত

প্রিয় মেহমানের রক্তের বদলা নেয়া হবে : সর্বোচ্চ নেতা

ইসমাইল হানিয়া (বামে) এবং সর্বোচ্চ নেতা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করার জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলকে কঠোর জবাব পেতে হবে। তিনি বলেছেন, ইসলামী প্রজতান্ত্র ইরান ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতার রক্তের বদলা নেয়া দায়িত্ব মনে করে।

৩১ জুলাই বুধবার ভোরে রাজধানী তেহরানে হামাস নেতার শাহাদাতের পরপরই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, "অপরাধী এবং সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী রেজিম আমাদের স্বদেশে আমাদের প্রিয় মেহমানকে শহীদ করেছে এবং আমাদেরকে শোকাহত করেছে, তবে এর মধ্যদিয়ে নিজের জন্য কঠোর শাস্তির ভিত্তি তৈরি করেছে।"

ইহুদিবাদী ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইসমাইল হানিয়ার দীর্ঘ আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী জীবনের প্রশংসা করেন সর্বোচ্চ নেতা। তিনি বলেন, ইসমাইল হানিয়া নিজে শহীদ হওয়ার জন্য এবং এই পথে তার পরিবারের সবাইকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

উজমা খামেনেয়ী বলেন, আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণের ব্যাপারে হানিয়া মোটেই ভীত ছিলেন না। তবে এই তিক্ত এবং ভয়াবহ ঘটনা যেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূখণ্ডে ঘটেছে সে জন্য জন্য তার রক্তের বদলা নেয়া আমরা দায়িত্ব বলে মনে করি।"

৩১ জুলাই বুধবার খুব ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়া ও তাঁর দেহরক্ষী শহীদ হন। ইসমাইল হানিয়াকে কাতারে দাফন করা হয়।

তেহরানে হামাস নেতা হানিয়ার জানাজায় লাখো মানুষের ঢল

ইসমাইল হানিয়ার কফিন নিয়ে তেহরানে লাখো জনতার শোকমিছিল

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার জানাজা ও শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী জানাজা নামাজের ইমামতি করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও এর আশেপাশে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

হেলিকপ্টার থেকে নেয়া নানা ভিডিও ক্লিপ ও ছবিতে এই দৃশ্য ধরা পড়েছে। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কজুড়ে ছিল মানুষের উপচে ভিড়। সবাই তাদের প্রিয় মেহমান শহীদ ইসমাইল হানিয়া ও তাঁর সফরসঙ্গী ওয়াসিম আবু শাবানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

৩১ জুলাই বুধবার খুব ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়া ও তাঁর দেহরক্ষী শহীদ হন। ইসমাইল হানিয়াকে কাতারে দাফন করা হয়।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি জানায়, তেহরানে হানিয়া ও তাঁর এক সঙ্গী তাদের অবস্থানস্থলে এক হামলায় শাহাদাৎবরণ করেছেন। এই হামলার বিষয়ে তদন্ত চলছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেন, প্রিয় মেহমান ইসমাইল হানিয়ার রক্তের বদলা নেওয়াকে ইরান নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। হামাস নেতা হানিয়া ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরানে এসেছিলেন।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক আল-কুদস দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক আল-কুদস দিবস উপলক্ষে ৫ এপ্রিল শুক্রবার রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) অডিট-রিয়ামে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল-কুদস কমিটি বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি

কুদস দিবসের আলোচনা সভা

প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম. সাখাওয়াত হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ও আল-কুদ্স কমিটি বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুল উলায়ীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী এবং বঙ্গবন্ধু গবেষক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব:) মোহাম্মদ আফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজী-বী অ্যাডভোকেট এ. কে. এম বদরুদ্দোজা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, মুসলমানদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসী ফিলিস্তিনিরা আজ নিজ দেশেই পরবাসী। শুধু পরবাসী বললে ভূল হবে বরং তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে নির্মূল করতে চাইছে যায়নবাদীরা। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আল-কুদস দিবস এমন সময় পালিত হচ্ছে, যখন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের পাশবিক হামলা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইহুদিবাদী ইসরাইল গাজা উপত্যকা এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে মজলুম ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর নতুন করে গণহত্যা শুরু করে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের হামলায় ৪০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭৪ হাজারের বেশি মানুষ। এছাড়া, গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদীদের এই বর্বর হামলায় ফিলিস্তিনিদের সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফিলিস্তিনে এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে এতো ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানির পরও যদি বিশ্altবিবেক জাগ্রত না হয় তবে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে। ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা যেভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ফিলিস্তিনের বিজয় একদিন আসবেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, প্রতিবছর রমজান মাসের শেষ শুক্রবার পালিত হয় আন্তর্জাতিক কুদস দিবস। নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ এবং

ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদীদের আগ্রাসনের নিন্দা জানাতে ও বিশ্বের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনি (রহ.) এই দিবসটি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন থেকে এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ ফিলিস্তিন ও গাজার নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে তাদের সংহতি ঘোষণা করছে। ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দিনটি বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুসলমানদের উচিত এই সুযোগকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বিজয়ের পর থেকে ইহুদিবাদী সেনারা নিজেদেরকে অপরাজেয় শক্তি মনে করতো। কিন্তু ইসরাইলে হামাসের সাম্প্রতিক অভিযান তাদের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে। ইমাম খোমেনী (রহ.) আল-কুদস দিবস ঘোষণা করে একটা যুগান্তকারী কাজ করে গিয়েছেন। এই দিবস পালনের মধ্যদিয়ে বিশ্বের মুসলমানদের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই দিবস ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বলেন, এই বছরের আন্তর্জাতিক কুদস দিবস অন্যান্য বছরের তুলনায় একেবারেই অন্যরকম। কেননা, এ বছর ফিলিস্তিনে মানবতার যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে, ইতিহাসের ভয়াবহতম ও নৃশংসতম গণহত্যা চলছে, তা আমাদের হৃদয়কে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তুলছে। নিরীহ ও নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি নারী-শিশুসহ বেসামরিক জনগণের উপর যায়নবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের চলমান এই আক্রমণ ও গণহত্যা অভিযান থেকে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি- তাহলো এমন ভয়াবহতার মুখেও বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলোর আশ্চর্যজনক নীরব ভূমিকা। আর এর বিপরীতে এমন নৃশংসতম জুলুমের মধ্যেও ফিলিস্তিনিদের অবিশ্বাস্য ঈমানী দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ।" তিনি আরো বলেন, "বর্তমানে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ও রাষ্ট্রের মৌলিক, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক দায়িত্ব। আর মুসলিম হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর ওপর এই দায়িত্ব আরো বেশি।"

ইমাম খোমেনী (রহ.) এই দিনটিকে ইসলামি দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার এই ঘোষণার কারণেই আজ আল-কুদস দিবস একটি বৈশ্বিক রূপ পেয়েছে। আনন্দের বিষয় হলো- আজ ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে পশ্চিমা দেশগুলোতেও ব্যাপক গণজাগরণ, বিক্ষোভ ও মিছিল দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মানবিকতার দাবিতে রাস্তায় নেমে এসেছে। ইসরাইল ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশাবাদী, এভাবেই একসময় এই নির্যাতনকারী ও জুলুমকারী রাষ্ট্রের পতন ঘটবে এবং ফিলিস্তিন ও আল-কুদস আবার স্বাধীন হবে। আর ফিলিস্তিনের এই পথচলায় গত ৪০ বছর ধরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তাদের পাশে রয়েছে, আগামীতেও থাকবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ও আল-কুদ্‌স কমিটি বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুল উলায়ী বলেন, মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ফিলিস্তিন বিষয়ে ইরানকেই সবচেয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইরান গাজা যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন নিয়ে যেসব কথা বলছে ও বলে আসছে যেগুলো মুসলিম উম্মাহরই কথা। মুসলিম বিশ্বের সব রাষ্ট্র সেভাবে মন খুলে কথা বলতে পারছে না। কিন্তু ইরান তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্ত অবস্থানের কারণে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সব কথা বলতে পারছে। আল-কুদস কমিটির পক্ষ থেকে আমরাও বাংলাদেশের মানুষকে ফিলিস্তিনের পক্ষে আরো বেশি সচেতন করার ও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। যদিও আমাদের এই চেষ্টা যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে আরো বেশি কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, কোনো জালেমই চিরস্থায়ী নয়। মজলুম ফিলিস্তিনিরা যেভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাতে সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট জায়নবাদীদের একদিন পতন হবেই।

অনুষ্ঠানে মেজর (অব) আফিজুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ফিলিস্তিনিদের পাশে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। ইয়াসির আরাফাত বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হামাসসহ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা যে গণসংগ্রাম করছে সেই গণসংগ্রামের ভাষা ও প্রকৃতি বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। বাংলাদেশের সরকার ও এদেশের জনগণ সবসময় ফিলিস্তিনের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে অ্যাডভোকেট এ কে এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, ইহুদিরা ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্র নয়। ফিলিস্তিনের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য যেকোন মূল্যে জরুরি। তিনি বলেন, বিশ্ব আল-কুদস দিবস ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে।

ইমাম খোমেনী (রহ.) -এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১ জুন শনিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুল উলায়ী। ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়েদ রেজা মীর মোহাম্মদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন। আর অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ইরানি রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, ইমাম খোমেনী (র.) ঠিক এমন সময় বিপ্লবের ঘোষণা দেন যখন অনেকেরই এ নিয়ে কোনো প্রত্যাশা ছিল না। সময়টা ছিল বিপ্লবের ঘোর বিরোধী। কিন্তু ইমাম খোমেনী (র.)-এর সঠিক নেতৃত্বে এই বিপ্লব সঠিকভাবে সংঘটিত হয়েছে এবং এই বিপ্লবের ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমরা আশা করছি, তাঁর দেখানো পথেই আমাদের পথচলা অব্যাহত থাকবে।

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইবরাহিম রায়িসির শাহাদাতের বিষয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সূচনার পর থেকেই ইরান অনেক সংকট মোকাবেলা করে আসছে। বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনী (র.) এবং ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর যোগ্য নেতৃত্বে এসব সংকট আমরা মোকাবেলা করে আসছি। প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শাহাদাতবরণ একটি মর্মান্তিক ঘটনা। এতে ইরানি জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, যে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার মতো নয়। তবে আমরা আশা করছি, ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার যোগ্য নেতৃত্বে ইরান এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী যেমনটি বলেছেন, ইরানের সকল কাজ আগের মতোই সুন্দরভাবে চলবে, এমনকি দেশটি আগের চেয়ে আরো গতিশীলভাবে এগিয়ে যাবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বকে পালন করবেন সেটা এরইমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে এবং শীঘ্রই পরবর্তী কর্মসূচি যথাসময়ে পালিত হবে। আপনারা দেখেছেন, প্রেসিডেন্ট ও তার সফরসঙ্গীদের জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল। কেননা তাঁরা তাদের কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন।

ইরানের রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের নিপীড়িত মজলুম মানুষের প্রতি ইরানের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। যেমনটি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করে বলেন, যারা জুলুম ও নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে তাদের পাশে রয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। ইরানের প্রেসিডেন্টের শাহাদাতে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ শোক ও সহমর্মিতা প্রকাশ করায় রাষ্ট্রদূত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান বলেন, তিন দশকেরও বেশি আগে আমরা ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতাকে হারালেও আজও আমরা শোকাহত। মুসলিম বিশ্বে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী নানা অত্যাচার-নির্যাতনের স্বীকার হয়ে যখন বিস্বাদ-হতাশায় ভুগছিল এবং ইমাম মেহেদীর অপেক্ষা করছিল তখন আয়াতুল্লাহ ইমাম খোমেনী (র.) সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। ইমাম মেহেদী কবে বিশ্বের মুসলমানদের উদ্ধার করবেন সেটা কেবল আল্লাহ জানেন। এই সময়টা যেহেতু আমাদের অজানা, তাই তিনি অলসতা করে বসে থাকতে চাইলেন না, আয়াতুল্লাহ খোমেনী (রহ). মুসলিম উম্মাহর ঐক্য চাইলেন।

আলোচনা সভায় শ্রোতাদের একাংশ

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ভিন্নতা থাকতেই পারে, ভিন্নতা না থাকলে সেটা মৃতের পর্যায়ে চলে যায়। তবে সেটা যেন বৈরিতায় পরিণত না হয়ে যায়। আমাদের সমাজে অনেক মাযহাব, অনেক তরিকা আছে। তবে সকলেই ইসলাম চর্চা করে। তাই এখানে বিরোধ করা উচিত নয়। ইসলামের বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে বিরোধই ইসলামের শত্রু। অমুসলিমরা আমাদের প্রধান শত্রু নয়, বরং ভণ্ড মুসলমানরাই ইসলামের বড় শত্রু। তিনি আয়াতুল্লাহ খোমেনী (র.) এর শাসন ব্যবস্থায় মানব সম্পদের উন্নয়নের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বলেন, ইমাম খোমেনী (র.)-এর বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে এমন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল যে, তিনি ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মতো একটি মহান বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার এই অনন্য ভূমিকা সমসাময়িক ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়। ইমাম খোমেনী (র.) এর আন্দোলন ও বিপ্লবের ফলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ইসলামী বিশ্বের মুসলমানরা ফিরে পায় তাদের সম্মান ও মর্যাদা। এর ফলে প্রকৃত ইসলামের ভিত্তিতে ইসলামী বিপ্লবের ডকট্রিন হিসেবে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বাইরে বিশ্বে নতুন এক ডকট্রিনের উদ্ভব ঘটে, যা অমুসলিমদের জন্যও ছিল নতুন। সম্প্রতি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানসহ অন্যান্য যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদেরকে স্মরণ করে তিনি বলেন, সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি ছিলেন একজন মানবদরদী মানুষ। তিনি কেবল নিজ দেশের মানুষের জন্যই কাজ করেননি, তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য কাজ করেছেন। যে কারণে তিনি দেশের ভেতরে ও বাইরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শাহাদাতে সারা বিশ্বের মানুষ শোক ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। তাঁর শাহাদাতে বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুল উলায়ী বলেন, ইমাম খোমেনী (র.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন সফল ব্যক্তিত্ব। সমকালীন যুগে কোনো মুসলিম মনীষীর মধ্যে এতগুলো সফল দিক বা গুণের সমাবেশ দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মানবিকতার শ্রেষ্ঠ রূপকার। সমগ্র বিশ্বজুড়ে আজ যে দ্বিধাবিভক্তি আর অপক্ষমতার চর্চা চলছে, তার বিপরীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। আর এর ভিত্তি রচিত হয়েছে ইমাম খোমেনীর মতো একজন দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক রাজনীতিবিদের কারণে। শুধু মুসলিম নয়, তিনি সকল নিপীড়িত জাতি ও মানবতার জন্য কাজ করেছেন বলেই ইরানের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ তিনি বিশ্বনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি ইসলামের সকল মাজহাবের অনুসারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি ফিলিস্তিনি জনগণসহ বিশ্বের সকল মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করতে তিনি রমজানের শেষ শুক্রবারকে আন্তর্জাতিক আল-কুদস দিবস ঘোষণা করে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর এই সুদূর প্রসারী পদক্ষেপের কারণেই মজলুম ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিশ্বমানবতা আজ জেগে উঠেছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ড. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন বলেন, ইমাম খোমেনী (র.) ছিলেন একাধারে একজন বড় দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, বিশ্বমানের রাজনীতিক, শ্রেষ্ঠ ইসলামী আইনজ্ঞ ও মুজতাহিদ, অনন্য সংগঠক, শ্রেষ্ঠমানের শিক্ষক, উঁচুমানের লেখক, কবি ও আধ্যাত্মিক নেতা। সাধারণত সুফি, সাধক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের খানকায় বসে ধর্মীয় কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু ইমাম খোমেনী (রহ.) এতো বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তার কর্মপরিধি একটি ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন, আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর যোগ্য উত্তরসূরী। রাসূল (সা.) যেমন হিজরত করেছিলেন এবং এরপর মক্কা বিজয় করেছিলেন তেমনি ইমাম খোমেনী (রহ.)ও ফ্রান্সে হিজরত করেছিলেন এবং ফ্রান্স থেকে ফিরে তিনি ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে বিজয়ী করেছেন, যে বিপ্লবের প্রভাব আজ বিশ্বময় সুবিস্তৃত।

আয়াতুল্লাহ রায়িসির শাহাদাতের ৪০তম দিন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের ৪০তম দিন উপলক্ষে সম্প্রতি রাজধানীর ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি এবং গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মেহদি হাসান পলাশ।

ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনাটি খুব মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা। এই ঘটনার ব্যাপারে এখনো ইরানে তদন্ত চলছে কিন্তু তদন্তের ফলাফল এখনো আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। ইবরাহিম রায়িসির শাহাদাতের ফলে যে সংকট তৈরি হয়েছে আমরা আশা করছি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তা কাটিয়ে উঠবে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি মজবুত। ইতোমধ্যে প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমি আশা করছি প্রেসিডেন্ট রায়িসির চলে যাওয়ায় যে শূণ্যতা তৈরি হয়েছে তার অনেকটাই পূরণ হবে এবং নয়া প্রেসিডেন্ট শহীদ প্রেসিডেন্ট রায়িসির দেখানো পথ অনুসরণ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

মানসুর চাভোশি বলেন, সাধারণত একটা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে ছয় মাস বা এক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় কিন্তু ইরান সেটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণেই। ইরান এখন সেই পরিপক্কতায় পৌঁছে গেছে যে, দেশটি এখন যেকোন সংকট খুব দ্রুততার সাথে উত্তরণ করতে সক্ষম। ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান সব সময় দেশ ও জাতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। একারণেই তাদের জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।

অনুষ্ঠানে গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানকে আলোচনা সভা বলা হলেও মূলত এটি একটি শোকসভা। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আপনাদের জানাতে চাই, শুধু ইরান নয়, সারা বিশ্বের মানুষ বিশেষ করে বিশ্বের মুসলমানরা তাঁর শোকে শোকাহত। মুসলিম বিশ্বের একটি সংকটকালে আমরা প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের হারিয়েছি। ইবরাহিম রায়িসি ছিলেন ঐতিহাসিক ইসলামী এবং আধুনিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ইসলামের মূল ধারার শিক্ষা উসুল আল-হিকম এর জ্ঞানে উদ্ভাসিত ছিলেন। যে কারণে তিনি দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসির মৃত্যুকে দুর্ঘটনা ভাবতে আমাদের সন্দেহ হয়। আমাদের ভাবনা,

প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান

এটি একটি ষড়যন্ত্র, যদিও এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। রায়িসি তুলনামূলক কম বয়সে মারা গেলেন। বেঁচে থাকলে তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতেন। ড. আনি-সুজ্জামান বলেন, বিশ্ব নেতৃত্বে ইরানের অবস্থান এখন উল্লেখ করার মতো। একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার কারণেই ইরান আজ বিশ্বের শক্তিশালী দেশ আমেরিকাকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছে। এ থেকে প্রমাণ হয়- "পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়, আল্লাহই যথেষ্ট"। আমি প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "মুসলিম বিশ্ব হলো একটি দেহের মতো, যেখানে একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো দেহেই ব্যথা অনুভূত হয়"। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তেমনই একটি দেশ যে দেশটি সবসময় মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি ইরানের এই নীতি আবস্থানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বলেন, ইরানের শহীদ প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি ছিলেন একজন মানবদরদী মানুষ। তিনি দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ও নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি দেশের সেবায় এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি কেবল নিজ দেশ ও তার দেশের জনগণের জন্যই কাজ করেননি; তিনি বিশ্বমানবতার জন্য কাজ করেছেন। বিশ্বের মজলুম মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর সময়ে মুসলিম দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ইরানের সম্পর্ক আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের ফলে কেবল ইরানি জাতির নয়, সমগ্র ইসলামী উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার মতো নয়। তিনি ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের মজলুম মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। আর এর কারণেই তাঁর শাহাদাতে সারা বিশ্বের মানুষ শোক ও সহমর্মিতা জানিয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতীয়ভাবে শোক পালন করেছে।

অনুষ্ঠানে দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মেহদি হাসান পলাশ বলেন, হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনাটিকে আমি কেবল দুর্ঘটনা বলবো না, এর পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসিকে হত্যা করা হয়েছে। হয়তো ২০ বা ৫০ বছর পরে এর সঠিক তথ্য উৎঘাটিত হবে। ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামাসসহ যেসব মুজাহিদ সংগ্রাম করছে এবং ইহুদিবাদীদের নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছে এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশ থাকলেও ইরান যেভাবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে এমন দেশ আর দ্বিতীয়টি নেই। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব দেশগুলো পরাজিত হলেও প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসির নেতৃত্বে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইহুদিবাদীদের বিরুদ্ধে ঠিকই রুখে দাঁড়িয়েছে। আরব দেশগুলো যা না পেরেছে ইরান তা করে দেখিয়ে দিচ্ছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে মূলত ইরানের অনুস-ারীরাই যুদ্ধ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের অনুসারীরা এখন এত শক্তিশালী হয়েছে যে, ইরান সমর্থিত হুথিদের প্রতিরোধের মুখে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এসব কিছুর

সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী

পেছনেই প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসির অবদান রয়েছে। প্রেসিডেন্ট রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করেন মেহদি হাসান পলাশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার রয়েছে। এসব প্রচারণা বন্ধ করতে হবে এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের সঠিক তথ্য আরো বেশি করে তুলে ধরতে হবে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট রায়িসির মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শোক

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের শহীদ হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোঃ সাহাবুদ্দিন।

ইরানের অন্তর্বর্তী সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবেরের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্য সফরসঙ্গীদের শাহাদাতে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সংকটে প্রেসিডেন্ট রায়িসির দূরদর্শী পদক্ষেপ ও তাঁর সাহস আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার মডেল হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট রায়িসির মৃত্যুতে ইরান একজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ নেতাকে হারালো।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও ইরানের ভাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি সমবেদনা জানান।

ইবরাহিম রায়িসির শাহাদাত: বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত

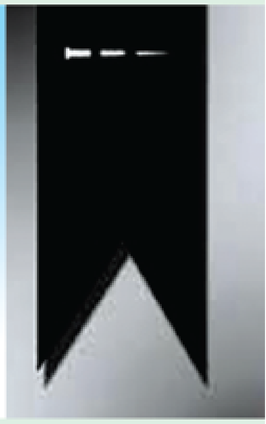

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের শাহাদাতের ঘটনায় ২৩ মে বৃহস্পতিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছে বাংলাদেশ।

শোক পালনের অংশ হিসেবে এদিন দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সব সরকারি-বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে।

এ দিন শহীদদের রুহের শান্তি কামনার জন্য বাংলাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

গত ১৯ মে আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রায়িসি। সেখানে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভও ছিলেন। সেখান থেকে তিনটি হেলিকপ্টারের বহর নিয়ে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রায়িসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানসহ অন্য কর্মকর্তারা। পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী বেল-২১২ মডেলের হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়।

প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর সোমবার ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা মেহের নিউজের খবরে বলা হয়, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসি দেশটির জনগণের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করার সময় একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদু-ল্লাহিয়ানসহ অন্য ব্যক্তিরা শহীদ হয়েছেন।

ঢাকায় 'কোরআন মজীদে নৃতত্ত্ব' ও 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'কোরআন মজীদে নৃতত্ত্ব' ও 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানারাত ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুস সবুর খান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ড. আনোয়ারুল কবির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অতিথিদের একাংশ

ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রভাষক এবং 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' শীর্ষক বইয়ের অনুবাদক তানজিনা বিনতে নূর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী।

অনুষ্ঠানে মানারাত ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুস সবুর খান বলেন, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ গ্রন্থগুলোর শতকরা আশি শতাংশই ফারসি সাহিত্য পূরণ করেছে। ইসলামী দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ঐতিহ্য এসব ধারার ফারসি বইগুলো ধারাবাহিকভাবে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে অনুদিত হয়ে আসছে। তিনি বলেন, আজকে আমরা যে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি তার একটি হলো 'কোরআন মজীদে নৃতত্ত্ব' এবং অপরটি হলো 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা'। 'কোরআন মজীদে নৃতত্ত্ব' বইটি লিখেছেন ইরানের খ্যাতিমান লেখক আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ তাক্বী মেসবাহ ইয়াযদী। তিনি তার এই বইটিতে পবিত্র কোরআনের আলোকে মানবজাতির ইতিহাস ও মানবিক চিন্তাধারায় নৃতত্ত্ব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' শীর্ষক বই প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. আব্দুস সবুর খান বলেন, বইটি খুবই আলোচিত একটি বই। বইটির লেখক আবদুল হোসাইন জাররিনকুব ইরানের বড়মাপের একজন লেখক, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ। খ্যাতিমান এই লেখক 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' শীর্ষক তার এই বইয়ে ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও আধ্যাত্মবাদসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তিনি এই মূল্যবান দুটি বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বই দুটি বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন হলো।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদী বলেন, বই প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো বইয়ের বিষয়বস্তু এবং

অপরটি হলো এর লেখক। উভয়দিক বিবেচনায় রেখেই আমরা বই দুটির বিষয়বস্তু নির্বাচন করি। এরমধ্যে একটি হলো কোরআন মজীদে নৃতত্ব' এবং অপরটি হলো 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা'। দুটি বিষয়ই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরানের খ্যাতনামা দুজন লেখক এই বই দুটি লিখেছেন। এরমধ্যে 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' বইয়ের লেখক ড. আব্দুল হোসাইন জাররিনকুব হলেন ইরানের একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক। যদি আমি ইরানের সেরা ৫ জন লেখকের নাম উল্লেখ করি তাহলে ড. আব্দুল হোসাইন জাররিনকুব হবেন তাদের অন্যতম। আর আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ তাকী মেসবাহ ইয়াযদি হলেন ইরানের একজন বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিক। আমি আশা করছি ইরানের খ্যাতিমান এই দুজন লেখকের বই দুটি বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের ইসলামের পথ-পরিক্রমা এবং কোরআন মজীদে নৃতত্ব সম্পর্কে জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক ড. আনোয়ারুল কবির বলেন, ইরানের প্রখ্যাত দুই লেখক আবদুল হোসাইন জাররিনকুব ও আয়াতুল্লাহ মোহাম্মাদ তাক্বী মেসবাহ ইয়াযদীর চিন্তাধারা বাংলা ভাষায় নিয়ে আসার উদ্যোগটি খুবই প্রশংসনীয়। 'কোরআন মজীদে নৃতত্ব' বইয়ের আলোচনায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত

মর পথ-পরিক্রমা' বইয়ের মতো ইরানের খ্যাতিমান লেখকদের বইগুলোর বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। বইগুলো বাংলাভাষাভাষীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ায় তিনি ঢাকাস্থ ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রভাষক এবং 'ইসলামের পথ-পরিক্রমা' শীর্ষক বইয়ের অনুবাদক তানজিনা বিনতে নূর বলেন, আধুনিক যুগের ফারসি ইতিহাস লেখক ও সমালোচনামূলক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন আব্দুল হোসাইন জাররিনকুব। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অর্জনকে তুলে ধরেছেন তিনি তার বিখ্যাত "কারনামেয়ে ইসলাম" বইটিতে, যার বাংলা অনুবাদ "ইসলামের পথ-পরিক্রমা" বইটি। বিশ্ব ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিমদের যে অবদান, তা ইউরোপীয় গবেষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত বইগুলোতে ঠিক সেভাবে উঠে আসে না, যেভাবে আসা উচিত। সেই জায়গাতেই এই বইটির অনন্য স্বার্থকতা যে, বইটি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার পথচলার ইতিহাস তুলে ধরেছে। মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র, যেমন- দর্শন, ইতিহাস, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি,

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অতিথিদের একাংশ

বিভিন্ন স্কলার ও চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আদি মানব পরিচয় তুলে ধরেন। তবে তিনি এই বইয়ের আলোকে ইরানের চিন্তাবিদদের কোরআনভিত্তিক মানব পরিচিতি ও নৃতত্বের যৌক্তিকতা সমর্থন করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের গবেষকদের মানব নৃতত্বের বিষয়ে গবেষণা অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ গবেষণার প্রভাবও পশ্চিমা বিশ্বে কীভাবে কাজ করছে সেটা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে খোদা ও আখিরাতের বিষয়াদি না থাকার কারণেই আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগ করার গুনাবলী কমে গেছে। 'কোরআন মজীদে নৃতত্ব' বইয়ের লেখক এই অসম্পূর্ণতা থেকে মানবজাতিকে বের করে আনার চেষ্টা করেছেন।

তিনি বলেন, আমি মনে করি 'কোরআন মজীদে নৃতত্ব' ও 'ইসলা-

সমাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অনন্য অবদান, তাই গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে। বাংলাদেশে যারা ইসলাম এবং বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা কিংবাা গবেষণা করেন, তাদের জন্য বাংলা ভাষায় এই বইটির সংস্করণ অন্যতম একটি রিসোর্স হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ইরানি ভিজিটিং প্রফেসর ড. মাজিদ পুইয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহসানুল হাদি ও কবি মাহমুদুল হক নিজামী।

রাশিয়ায় সামরিক প্রযুক্তিগত ফোরামে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রদর্শন

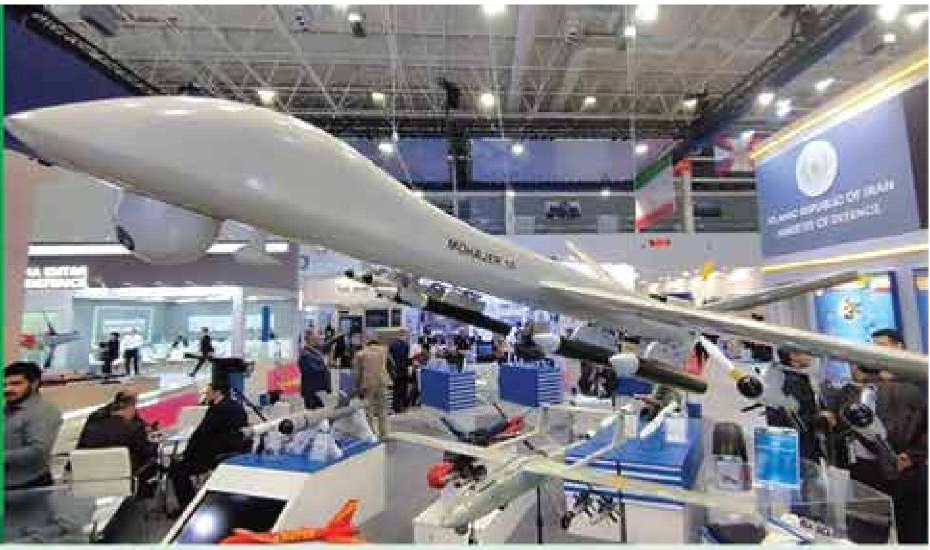

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সামরিক-প্রযুক্তিগত ফোরাম 'আর্মি-২০২৪' এ ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার একটি অংশ প্রদর্শন করা হয়েছে। মস্কোর প্যাট্রিয়ট পার্কে রুশ ফেডারেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রদর্শনের আয়োজন করে। আইআরজিসি'র খাতামুল আম্বিয়া সদর দফতরের উপ-সমন্বয়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী শাদমানির নেতৃত্বে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিদল রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সামরিক-প্রযুক্তিগত এই ফোরাম পরিদর্শন করে।

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের উচ্চ-পদস্থ ইরানি সামরিক প্রতিনিধিদল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য অন্যান্য দেশের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলোচনা করবে।

'আর্মি-২০২৪' মস্কোর কুবিনকা বিমানঘাঁটি এবং অ্যালাবিনো সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ডে ১২-১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

ছয়টি দেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রদর্শক এবং ৮৩টি কোম্পানি ফোরামের এবারের পর্বে অংশ নেবে। এছাড়াও ১৮টি উচ্চ পদস্থ সামরিক প্রতিনিধি দল প্রদর্শনে অংশ নেবে।

ইরানের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের আন্তর্জাতিক চাহিদা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক কমিশনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, গত তিন বছরে ইরানে প্রতিরক্ষা শিল্প রপ্তানি ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক কমিশন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা কারাই আশতিয়ানীর সঙ্গে একটি যৌথ বৈঠক করেছে। পার্সটুডের রিপোর্ট অনুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশতিয়ানি ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্জনের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি বলেন, ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যা অর্জিত হয়েছে তা স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই অর্জিত হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, গত ৩ বছরে দেশটির প্রতিরক্ষা রপ্তানি চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতি কমিশনের মুখপাত্র রেজাইয়ের মতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশতিয়ানি এই বৈঠকে রিপোর্ট করেছেন যে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী অত্যধিক ব্যয় করা সত্ত্বেও তার বিমান প্রতিরক্ষা সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্বলতায় ভুগছে।

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কমিশনের মুখপাত্র স্পষ্ট করেছেন যে গত তিন বছরে ইরানের সামরিক উৎপাদন ২.৫ গুণ বৃদ্ধি ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অন্যান্য যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি।

ইরানি নারীদের অগ্রগতিতে আমি রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত: জিম্বাবুয়ের নারী বিষয়ক মন্ত্রী

জিম্বাবুয়ের নারী বিষয়ক মন্ত্রী মনিকা মুৎসবাঙ্গোয়া বলেছেন, তিনি ইরানি নারীদেও অগ্রতিতে রোমাঞ্চিত এবং নারীদের ক্ষমতায়নে ইরান সরকারের পদক্ষেপে বিস্মিত।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নারী ও পরিবার বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট আনিসা খাযয়ালির সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জিম্বাবুয়ের নারী, সমাজ, উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বিষয়ক এই মন্ত্রী তার ইরান সফরের কথা স্মরণ করে বলেন, জিম্বাবুয়ের জনগণের সংগ্রামের পথে ইরানের সহযোগিতা ও সমর্থন দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত করেছে। তিনি আরো বলেন, ইরান ও জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের অন্যায্য এবং একতরফা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

বৈঠকে ইরানের নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট আনিসা খাযয়ালি বলেন, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুই দেশেরই ভূমিকা রয়েছে এবং উভয় দেশ স্বাধীনচেতা নীতি অনুসরণ করে। দুই দেশের এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে গভীর করেছে।

দুই নেত্রীই অবরুদ্ধ গাজার নারীদের শোচনীয় অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে সেখানে অবিলম্বে দখলদার ইসরাইলের মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধের দাবি জানান।

হাড় জোড়া লাগাতে ইরানি বিশেষজ্ঞদের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু

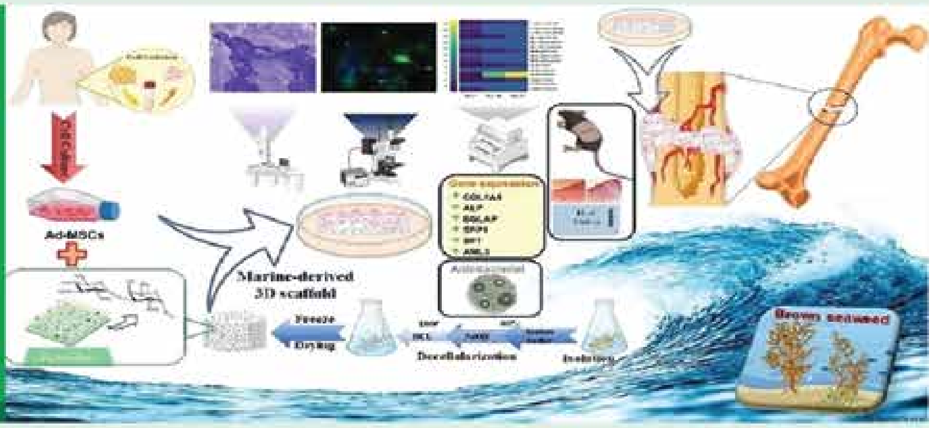

ইরানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হাড় জোড়া লাগাতে স্টেম সেল ও সামুদ্রিক শৈবাল ব্যবহার করে নতুন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করেছেন।

হাড়ের নিরাময় হলো একটি শারীরবৃত্তীয় ও বৃদ্ধি-প্রসারণকারী প্রক্রিয়া যেখানে হাড়ের ক্ষত এবং ফ্র্যাকচার মেরামত করা হয়।

সম্প্রতি ইরানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে এই সমস্যার একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তারা হাড় জোড়া লাগানোর কাজে স্টেম সেল ও পারস্য উপসাগর থেকে সংগৃহীত বাদামী রঙের সামুদ্রিক শৈবাল ব্যবহার করেছেন।

ইরানি বিজ্ঞানীদের এই চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষাগার এবং প্রাণীর দেহ উভয় ক্ষেত্রেই হাড় জোড়া লাগা ও হাড়ের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এই উদ্ভাবনী চিকিৎসা পদ্ধতিটি ইরানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষকলা বিজ্ঞান, বায়োম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন বায়োলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অর্থোপেডিকস বিশেষজ্ঞদের যৌথ সহযোগিতায় উদ্ভাবিত হয়।

এ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা টেকনোলজি অ্যান্ড মেরিন লাইফ সায়েন্সে (গধৎরহব খরভব ঝপরবহপব, এবপযহড়ষড়মু) প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিশ্বের মোট বিজ্ঞান বিষয়ক উৎপাদনের দুই শতাংশ ইরানে উৎপাদিত হয় যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইরানের মাইক্রোইলেকট্রনিক্স সামগ্রী কিনছে নাসা ও এমআইটি

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয় ইরানে উৎপাদিত মাইক্রোইলেকট্রনিক্স সামগ্রী কিনছে বলে খবর দিয়েছেন ইরানের ন্যাশনাল মাইক্রোইলেকট্রনিক্স প্রোগ্রামের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিমা আর্জমান্দি।

তিনি ন্যানো ও শিল্প থিঙ্ক ট্যাঙ্কে অনুষ্ঠিত মাইক্রোইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি ইকোসিস্টেম ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের এক বৈঠকে এ তথ্য জানান।

ইরানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের চাহিদা মিটিয়ে এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে জানিয়ে আর্জমান্দি বলেন: ইরানের কোনো কোনো মাইক্রোইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠান নাসা ও গওঞ'র কাছে তাদের মাইক্রোইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম ও সফটওয়্যার বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ইরানের এসব কোম্পানির ১৫টি দপ্তর রয়েছে এবং তারা এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামগ্রী রপ্তানি করতে পেরেছে। পার্সটুডে ফার্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, আর্জমান্দি আরো বলেন: ইরানে মাইক্রোচিপসের বাজারের ওপর কারো একচেটিয়া আধিপত্য নেই; উদাহরণস্বরূপ, ইরানের কয়েকটি কোম্পানি সিলিকন সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি করছে।

মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কয়েকটি কোম্পানি ইরানের ন্যানো হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করেছে এবং তাদের পণ্য উৎপাদন জোর গতিতে চলছে। আর্জমান্দির দেয়া তথ্য অনুসারে, এসব কোম্পানি এখন বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ইরানের ন্যাশনাল মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স প্রোগ্রামের ভাইস প্রেসিডেন্ট 'পিশরান' নামের ন্যাশনাল চিপ ডিজাইন সেন্টার চালুর কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: এই কেন্দ্রটি মাইক্রোচিপ ডিজাইনে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা ইরানের প্রত্যেকে ব্যবহার করতে পারে। এটি কোনও বিশেষ অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একচে-টিয়া অধিকারভুক্ত নয় বলেও তিনি জানান।

আরজামান্দি বলেন, পিশরান ন্যাশনাল চিপ ডিজাইন সেন্টারে চিপ ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে এবং এটিমাইক্রোচিপ ডিজাইন করতে ও পণ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা করতে সহায়তা করে।

ন্যানো প্রযুক্তিতে বিশ্বে ইরানের অবস্থান পঞ্চম

ইরানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনের অবস্থা বিষয়ক সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে ন্যানো প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনায় ইরান বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর ইরান বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশ্বের ২ শতাংশ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইরানে উৎপাদিত হয়।

ন্যানো প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, তথ্য এবং গবেষণা নিবন্ধের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত ওয়েব অফ সায়েন্স ডাটাবেসের (ডড়ঝ) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৩ সালে ইরানি গবেষকরা ন্যানোপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১ হাজার ১৭৯টি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন যা গত বছর প্রকাশিত ন্যানো সংক্রান্ত সমস্ত নিবন্ধের ৪.৬ শতাংশ।

২০০০ সালে ন্যানো প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইরান যেখানে ৫৮তম স্থানে ছিল সেখানে ২০০৩ সালে দেশটি পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এই র‍্যাঙ্কিং ইরানের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখ্য, ওয়েব অফ সায়েন্স ডাটাবেসের প্রতিবেদনে বিজ্ঞান ও ন্যানো প্রযুক্তিতে ইরানের বৈশ্বিক অবস্থান তিনটি প্রধান সূচক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এগুলো হলো- ন্যানোপ্রযুক্তি নিবন্ধের পরিমাণ, ন্যানো প্রযুক্তি নিবন্ধের গুণমান এবং ন্যানো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সংখ্যা।

প্যারিস অলিম্পিকে ইরানের ক্রীড়াদলের প্রতি সর্বোচ্চ নেতার শুভেচ্ছা বার্তা

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ২০২৪ সালের অলিম্পিক গেমসে ইরানের ক্রীড়াদলের অংশগ্রহণ ও ক্রীড়া আসর শেষ হওয়ার এক বার্তায় ক্রীড়াবিদ, ফেডারেশনের প্রধান এবং কোচদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ইসলামী বিপ্লবের নেতাকে সম্বোধন করে ইরানের জাতীয় অলিম্পিক

কমিটির প্রধান একটি চিঠি লিখেছেন। অলিম্পিক গেমসে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্রীড়া কাফেলার সদস্যদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে ওই চিঠিতে।

ইরানের ক্রীড়াপ্রেমী জনগণকে আরও অনুপ্রাণিত করার জন্য আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী ক্রীড়াবিদদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সর্বোচ্চ নেতা জাতীয় অলিম্পিক কমিটির প্রধানের চিঠির ফুটনোটে লিখেছেন:

আমি দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন আমাদের ক্রীড়াবিদ, ফেডারেশনের সভাপতি ও কোচসহ জাতীয় অলিম্পিক কমিটির প্রতি আন্তরিক-ভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা সাম্প্রতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-য় ইরানকে বিশ্ব ক্রীড়া অঙ্গনে আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছেন। আপনাদের উত্তরোত্তর সাফল্য ও শুভকামনা করছি।

জাতীয় অলিম্পিক কমিটির প্রধান মাহমুদ খোসরাভিওয়াফা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্রীড়া দলের সাফল্যের বিষয়ে তার চিঠিতে ইরানের কিছু ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরানের ক্রীড়া কাফেলায় নারীদের অভূতপূর্ব উপস্থিতি এবং নারীদের অসাধারণ প্রতিভার কথাও তুলে ধরেন ওই চিঠিতে। প্রথমবারের মতো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ইরানি ক্রীড়াবিদরা বেশ কয়েকটি ইভেন্টে গুরুত্বপূর্ণ শিরোপা জয় করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্যারিস অলিম্পিক : কুস্তিতে দলগত চ্যাম্পিয়ন ইরান

ইরানের জাতীয় কুস্তি দল প্যারিস অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। সেইসঙ্গে ইরানের তায়কোয়ান্দো দল ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের রানার-আপ শিরোপা জিতেছে।

গত ২৬ জুলাই ৩৩তম প্যারিস অলিম্পিক গেমস ২০২৪ এর উদ্বোধন করা হয় এবং ১২ আগস্ট এক সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গেমসের সমাপ্তি টানা হয়। ইরানের জাতীয় কুস্তি দল এই অলিম্পিকে ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

তায়কোয়ান্দোতে ইরানি ক্রীড়াবিদ অ্যারিয়ান সালিমি স্বর্ণপদক এবং নাহিদ কিয়ানি ও মেহরান বারখোরদারি রৌপ্যপদক ও মুবিনা নেয়ামতজাদে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এর মাধ্যমে এবারের অলিম্পিকে দলগতভাবে তায়কোয়ান্দোতে ইরান রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নিউজ লেটারের গ্রাহক বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিউজ লেটার নিয়মিত পেতে হলে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বরাবর ১ বছরের গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা +৮৮০ ১৯২৪-৭৩৩১৮৩ নাম্বারে বিকাশ করে পিন নাম্বারসহ নিউজলেটার পাওয়ার ঠিকানাটি +৮৮০ ১৯২৪-৭৩৩১৮৩ নাম্বারে এস এম এস করতে হবে।

যোগাযোগের সময়

সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা

সার্কুলেশন বিভাগ, নিউজলেটার

বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরনো ৩২)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।

মোবাইল: +৮৮০১৯২৪-৭৩৩১৮৩

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট দেখুন

www.iranmirrorbd.com,
https://bn.icro.ir/Dhaka|
https://www.instagram.com/
iran_cultural_center_dhaka/ (সোশ্যাল মিডিয়া)

এতে রয়েছে বাংলায় ডাবিংকৃত ইরানি চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি, ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ -সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসহ নানা তথ্য। তাছাড়া থাকছে ফারসি ভাষা শিক্ষা, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামী দর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ। কাজেই আর দেরি না করে ভিজিট করুন এ দু'টি ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া।

রেডিও তেহরান

আইআরআইবি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ইরান।

website: parstoday.com/bn Email: radiotehran@ws.irib.ir Tel: +98-21-22013764

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার (আইআরআইবি) বিশ্ব কার্যক্রমের অধীনে বাংলা অনুষ্ঠানের সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৮২ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে। আর রেডিও তেহরানের অনলাইন সংস্করণ পার্সটুডে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে মূলধারার গণমাধ্যম হিসেবে কাজ শুরু করে।

অনুষ্ঠান সূচি

অধিবেশনের শুরুতে বাংলা অনুবাদসহ কুরআন তেলাওয়াত। এরপর বিশ্বের সর্বশেষ খবরাখবর নিয়ে পরিবেশিত হয় বিশ্বসংবাদ। এতে থাকে ঢাকা ও কোলকাতার বিশেষ কিছু খবর। এরপর সংবাদভাষ্যের অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাতে প্রচারিত হয় বিশেষ প্রতিবেদন।

ফ্রিকুয়েন্সি

সান্ধ্য অধিবেশন	৪৯ মিটার ব্যান্ডে	৬১৫০ কিলোহার্টসে (বাংলাদেশ ও ভারতে)
সান্ধ্য অধিবেশন	৩১ মিটার ব্যান্ডে	৯৮৭০ কিলোহার্টসে (সৌদি আরবে)
নৈশ অধিবেশন	৪৯ মিটার ব্যান্ডে	৬১৫০ কিলোহার্টসে (বাংলাদেশ ও ভারতে)

প্রচার সময়

ইউটিসি সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৪:২০-১৫:২০	নৈশ অধিবেশন	১৬:২০-১৬:৫০
বাংলাদেশ সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	২০:২৩-২১:২৩	নৈশ অধিবেশন	২২:২৩-২২:৫৩
ভারত সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৯:৫৩-২০:৫৩	নৈশ অধিবেশন	২১:৫৩-২২:২৩
সৌদি আরব সময়	সান্ধ্য অধিবেশন	১৭:২৩-১৮:২৩	পুনঃপ্রচার	০৩:৫০-৪:৫০

* আমাদের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ্‌র-৫ স্যাটেলাইটেও প্রচারিত হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

www.facebook.com/groups/radiotehran	www.facebook.com/RadioTehranBN
www.instagram.com/parstodaybangla	twitter.com/Radio TehranBN

চিঠি লেখার ঠিকানা

ইরান
Bangla Program, Radio Tehran Post Box No- 6767-19395 Tehran, Iran